১৪

বিশ্বের খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার

পঞ্চদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

দ্রুতগামী ছোট জাহাজ
(খ্রীষ্টফার কলম্বাসের চিঠি থেকে)

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বড় বড় ভৌগলিক আবিষ্কারগুলোই বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টাদর্শ প্রচারের সূচনা স্থাপন করে। এ সময় হতেই খ্রীষ্টমণ্ডলী সত্যিকার অর্থে 'বিশ্বজনীন' হয়ে উঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য, উপনিবেশ স্থাপন, রাজনৈতিক ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনাগুলো ও বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মঙ্গলবাণী প্রচার নানা পরিণতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং এভাবে সময় সময় এর বিশুদ্ধতাও হারিয়ে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও মঙ্গলবাণী প্রচারে উল্লেখযোগ্য একদল মানুষ তিন শতাব্দীতে প্রচুর সাফল্যও লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশে প্রচারক্ষেত্রগুলোকে কেন্দ্র করে মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ সংকট আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ফরাসী বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ বিগ্রহ মণ্ডলী ও সাগরপারের দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক তখনকার মতো চলমান ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে।

॥১ ॥বর্তমানকালের বাণীপ্রচারমূলক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

১। অবস্থা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদন অবস্থা

বড় বড় ভৌগলিক আবিষ্কারগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার দূরবর্তী অভিযানগুলোর বস্তুগত, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভর করত। মানবতাবাদীরা এই সত্যটি নতুন ক'রে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন যে, পৃথিবীর আকার গোল যেমনটা প্রাচীনকালে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে বসানো চাকা-চালিত হাল, দিক-নির্ণয় যন্ত্র, একই জাহাজে মাস্তুল ও পালের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি স্পেন উপদ্বীপে হালকা দ্রুতগামী জাহাজ নির্মাণের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। এই জাহাজ সাহসিকতার সঙ্গে সমুদ্রকে মোকাবিলা করার পথও প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল। তবে জাহাজ যাত্রা আগের মত ধীরগতি ও বিপজ্জনক রইল না এবং এর ফলাফল বাণীপ্রচার কার্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লিসবন থেকে গোয়া (ভারতের) আসা-যাওয়ার জন্য তখন সময় লাগত আঠারো মাস থেকে দু'বছর; সেভিল ও ম্যানিলার (ফিলিপাইন) মধ্যে যাতায়াতের জন্য লাগত পাঁচ বছর এবং এ যাত্রায় যারা সঙ্গী হত, তাদের অর্ধেকই পথিমধ্যে মারা যেতে পারত। এ থেকে বুঝতে পারা যায় কেন তখন এত অধিক সংখ্যক মিশনারীকে হারাতে হত এবং বিশপদের মনোনয়ন ইউরোপে হত ব'লে মিশন দেশে বিশপ-আসনগুলো এত দীর্ঘকাল শূন্য পড়ে থাকত; সেই সঙ্গে বিলম্বিত বাদানুবাদের, যেমন – ধর্মাচার নিয়ে মতানৈক্যের কারণও বুঝা যায়।

সোনা, মশলাপাতি ও মানবাত্মা

খ্রীষ্টধর্মের ফসল একটি গোটা সমাজই তখন সমুদ্র যাত্রা শুরু করল। ভৌগলিক আবিষ্কারগুলোর স্থাপনকারীদের উদ্দেশ্যটা লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থনৈতিক অবস্থা ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোকে একদিকে সোনার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করে, কারণ প্রাচ্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সোনার একান্ত প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে গাছগাছালি হতে প্রাপ্ত ও দাসশ্রমে উৎপন্ন সস্তা মশলাপাতি লাভের উদ্দেশ্যেও পাশ্চাত্যের দিকে অভিযান চালাতে বাধ্য করে।

(সাধু ব্রেণ্ডান ও মার্কো পোলোর ন্যায় ব্যক্তিদের) সমুদ্রযাত্রার কাহিনী যেমন মানুষের কল্পনাশক্তিকে আলোড়িত করেছিল, ঠিক তেমনি ধর্মযুদ্ধের ধারণাটিও মানুষের মনে তখন জীবন্ত ছিল। পর্তুগাল কর্তৃক মুসলমানদের কবল হতে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিউটার অধিকার ও স্পেনীয়দের গ্রানাডা (১৪৯২) পুনর্দখলই ছিল প্রধান প্রধান অভিযানগুলোর সূচনা-বিন্দু।

সেই রহস্যময় প্রেস্টার জন, যিনি এখন ইথিওপিয়া দেশে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে, তাঁর দ্বারা কি ইসলাম ধর্মকে পিছন থেকে আক্রমণ ক'রে জয় করা যাবে না ? আমরা কি সেই অন্তিমকালে এসে পৌঁছায়নি যখন আবিষ্কৃত জগত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত জেরুসালেমের একাত্মতায় ঐশরাজ্য পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ?

অনেক মানুষই আবার লক্ষ লক্ষ আত্মার নরকদণ্ড এড়াতে সক্ষম হওয়ার আশাও করত। প্রটেস্টান্টরা রোমীয় মণ্ডলীতে যে ক্ষতি করেছিল, তা পূরণ করার ধারণা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে কাথলিকদের মধ্যে হঠাৎ করেই জন্মলাভ করে। মণ্ডলীর ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে সাগরের ওপারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক মানুষই আভ্যন্তরীণ প্রচারক্ষেত্র ও বিদেশের প্রচারক্ষেত্রের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

সমস্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদনই, যেমন – 'সোনা, মশলাপাতি ও মানবাত্মা'– এ সময় অচ্ছেদ্যভাবে মিলেমিশে [১৮৭]
একাকার ছিল। আবিষ্কারক, বিজেতা ও বাণীপ্রচারকগণ এমনভাবে আচরণ করেন যা আমাদের কাছে স্ব-বিরোধী ও বিঘ্নজনক ঠেকে। তারা ক্রুশ স্থাপন করে, আবার ইণ্ডিয়ানদের নির্বিচারে জবাই করে। মেক্সিকোতে কোর্টেজ মারিনা নাম্নী একজন স্ত্রীলোককে তার উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার আগে দীক্ষাস্নান করান। পেরুতে পিজ্জারো ইন্‌কা আতাহুয়াল্লার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ দাবি করেন, তাকে দীক্ষাস্নাত করেন ও তারপর তাকে গলা টিপে হত্যা করতে আদেশ দেন (১৫৩৩)।

২। বাণীপ্রচার সংগঠন

পৃষ্ঠপোষকতা

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্মযুদ্ধ-সংক্রান্ত কয়েকটি পোপীয় অনুশাসন পত্রে রোমের পুণ্য দপ্তর বিজিত ও যা পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হবে সে সমস্ত ভূমির উপর পর্তুগীজদের আইনগত জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সার্বভৌম অধিকার প্রদান করে।

খ্রীষ্টফার কলম্বাস কর্তৃক ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ" (আমেরিকা) আবিষ্কার আইবেরিয়ান উপদ্বীপে দুই রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে।

১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার নিয়ন্তারূপে এই বিরোধের সমাধান দেন। তিনি নব আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো এভাবে চিহ্নিত ও বিভক্ত করেন ঃ পশ্চিমাঞ্চল দেওয়া হয় স্পেনীয়দের আর পূর্বাঞ্চল দেওয়া হয় পর্তুগীজদের। মণ্ডলী সংগঠনের দায়িত্ব, যেমন – ধর্মপ্রদেশগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা, ধর্মপালদের নিয়োগ ইত্যাদির

[১৮৭] সোনা, মশলাপাতি ও মানবাত্মা

খ্রীষ্টফার কলম্বাসের লেখা নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে আমেরিকা আবিষ্কারের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে – ধর্মযুদ্ধ, অনাগত স্বর্ণযুগের স্বপ্ন, ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই, সোনা, মশলাপাতি ও দাস-সন্ধান এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করা ইত্যাদি।

খ্রীষ্টফার কলম্বাসের চিঠিপত্র ও সমুদ্রযাত্রাকালে জাহাজের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপের রেকর্ড থেকে অংশবিশেষ

"চলতি বছর ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহামান্যগণ (স্পেনের ইসাবেলা ও ফার্ডিনাণ্ড) ইউরোপ শাসনকারী মূরদের সঙ্গে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান ও অত্যন্ত চমৎকার শহর গ্রানাডায় এর ইতি টানেন। পবিত্র খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুগত ও এর সম্প্রসারক, হযরত মোহাম্মদের অনুসারীদের এবং সমস্ত মূর্তিপূজক ও ভ্রান্ত মতবাদের শত্রু কাথলিক রাজপুত্ররূপে মহামান্যগণ তথাকথিত ভারতীয়দের দেশের অভিমুখে সেখানকার রাজা ও প্রজাদের সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করতে, ভূমির ও অন্য সব কিছুর বিন্যাস লক্ষ্য করতে এবং আমাদের পুণ্য বিশ্বাসে এ সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীকে কিভাবে দীক্ষিত করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে আমাকে অর্থাৎ খ্রীষ্টফার কলম্বাসকে প্রেরণের মনস্থ করেছেন। আর আপনারা নির্দেশ দেন আমি যেন গতানুগতিক পথে পূর্ব দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকেই যেন যাই – যে পথের কথা আমরা এটুকুই জানি যে, এ যাবৎ এ পথে কেউই যায়নি। তাই আপনাদের রাজ্য হতে ইহুদীদের যাকেই পাওয়া যাবে তাদের সকলকেই বিতাড়িত ক'রে আপনারা মহামান্যগণ এ সমস্ত দেশে পর্যাপ্ত রণতরীর বহরসহ আমাকে প্রেরণের মনস্থ করেছেন।"

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হিস্পানিয়োলাতে (হাইতি)

"তাঁরই অপার দয়ায় আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট লক্ষ্য রাখুন যেন আমি এই সোনার খনি খুঁজে পাই ... আমি আশা করি যখন আমি ফিরে যাব তখন আমার লোকেরা এক পিপা ভরতি সোনা সংগ্রহ করবে এবং সোনার খনি আবিষ্কৃত হবে। সেখানে প্রচুর মশলাপাতিও থাকবে নিশ্চয়। তিন বছরের মধ্যে আপনারা মহামান্যগণ জেরুসালেম পুনর্দখলের অভিযান চালাতে পারবেন।"

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ – তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা

"যতগুলো দাস-দাসী বিক্রয় করা যেতে পারে এখান থেকে পবিত্র ত্রিত্বের নামে ততগুলোই প্রেরণ-করা যায় এবং সেই সঙ্গে ব্রাজিল কাঠও (অংকনের জন্য ব্যবহার্য কাঠ) পাঠানো যায়।... কাস্তিল, পর্তুগাল ও আরগনে বহু দাস-দাসীর প্রয়োজন রয়েছে। আমার মনে হয় না গিনি দেশ থেকে এখন আর তাদের পাওয়া যাবে; আর যদিও বা পাওয়া যায়, এখানকার একটি দাস/দাসীর মূল্য ওখানকার তিনটির সমান। ... কাজেই এখানে আছে দাস-দাসী ও ব্রাজিল কাঠ। এমন কি সোনাও আছে যদি যিনি (ঈশ্বর) আমাদের তা দেখিয়েছেন, এবং তিনি তা আমাদের যথাসময়ে দিতে প্রসন্ন হন।"

১৫০২ – ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ ঃ চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা

"সোনা, সে কি এক চমৎকার জিনিস ! এই সোনা হতেই আসে সম্পদরাজি। যার সোনা আছে, সে এই পৃথিবীতে যা খুশী তা-ই করতে পারে। সোনা দিয়ে এমন কি মানবাত্মাদেরও স্বর্গে আনা যায়।"

দায়িত্ব পোপ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দু'রাজার উপর ছেড়ে দেন। তাই এক প্রকারে উক্ত রাজাদ্বয় নতুন মণ্ডলীসমূহের প্রধান হয়ে উঠেন। পোপ মহোদয় সরাসরি কোন হস্তক্ষেপ না ক'রে রাজাদের নিয়োগদানকে সমর্থন ও অনুমোদন দিয়েই খুশি ছিলেন। এ সমস্ত সুবিধার সবগুলোর সমন্বয়েই বলা হয় পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার ঃ পর্তুগীজ ভাষায় padroado আর স্পেনীয় ভাষায় patronato। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতা মারাত্মক কিছু অসুবিধার কারণ হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার উপনিবেশন ও রাজনীতির সকল ঘৃণার বস্তু হয়ে ওঠে। পর্তুগাল ও স্পেন তাদের অধিকারের প্রশ্নে ঈর্ষাকাতর ব'লে প্রতিপন্ন হয়, এমন কি যখন তাদের পক্ষে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা অসম্ভব ছিল। ১৫ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত একটি দেশ পর্তুগাল পৃথিবীর অর্ধেক জুড়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর যাবতীয় প্রয়োজনের যোগান দিতে সমর্থ ছিল না। সকল বিদেশী ধর্মপ্রচারকগণ লিসবনের মাধ্যমে যাবে ব'লে পুর্তগাল দাবী ক'রে বসে। স্পেনের রাজাগণ ছিলেন অপেক্ষাকৃত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু অন্য জাতিও, যেমন – ফ্রান্সও বিশ্বজয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিস তো সশ্লেষে বলেই ফেলেন ঃ "আমি আদমের শেষ ইচ্ছাপত্রের সেই দফাটিই পাঠ ক'রে দেখতে চাই যেখানে বিশ্বকে অংশে অংশে ভাগ ক'রে নেওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।"

ধর্ম-সম্প্রসারণ সংসদ

উপরোল্লিখিত অসুবিধাগুলো পোপ মহোদয়কে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম-সম্প্রসারণ সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শক্ত হাতে মঙ্গলবাণী প্রচারকার্যকে ধরে রাখতে প্রণোদিত করে। উক্ত সংসদটি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রান্তমতাদর্শী ও ধর্মবিচ্ছেদকারীদের মন পরিবর্তনের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। তবে পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার ভঙ্গ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধিকারক্ষেত্র নিয়ে ঝগড়া বাড়তেই থাকল।

ধর্ম-সম্প্রসারণ সংসদটি (বর্তমানে এই সংসদ "মঙ্গলবাণী প্রচার সংসদ" নামে পরিচিত) ছিল এক ধরনের প্রেরণকার্যক্ষেত্রসমূহের সেবাকার্য। এর সর্বপ্রথম সেক্রেটারী ইনগলির তাড়নায় তাড়িত হয়ে গোটা বিশ্বে প্রেরণমূলক কার্যাবলীর বিষয়ে একটি ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। এই সংসদ কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পদ, যেমন – বহুভাষিক মুদ্রণালয়, সেমিনারী ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির যোগান দিত। তা ছাড়া প্রৈরিতিক প্রতিনিধি, প্রেরণকার্যের নিমিত্ত ধর্মপালদের নিযুক্ত করাও ছিল এর কাজ – এঁরা সরাসরি পোপের নিকট দায়ী ছিলেন।

প্রেরণকর্মীগণ

ধর্মপ্রদেশীয় যাজকগণ বিজেতাদের সফরসঙ্গী হতেন। এঁরা ছিলেন প্রায়শঃ এমন লোক যাদের মনে ছিল বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সন্দেহ কিংবা ইউরোপে অসুবিধার মধ্যে ছিলেন অথবা তাঁরা ছিলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রিক যাঁরা অঢেল অর্থ উপার্জন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মঙ্গলবাণী প্রচারে তাঁদের ভূমিকা ছিল সীমিত। নতুন বিশ্বে আদি প্রেরণকর্মীগণ ছিলেন মূলতঃ সুপ্রাচীন ধর্মসংঘগুলোর সভ্য, যেমন – মিনিমন্স, আগস্তি নিয়ন্স, কার্মেলাইটস্, মার্সিডারিয়ান্স এবং সর্বোপরি ফ্রান্সিসকান ও ডমিনিকান। ফ্রান্সিস জেভিয়ারকে নিয়ে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে যেজুইটগণ প্রেরণকার্য ক্ষেত্রসমূহে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। তাঁরাই হয়ে উঠেন প্রৈরিতিক আধ্যাত্মিকতা ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট বর্তমানকালের বাণীপ্রচার কার্যের প্রথম প্রেরণকর্মী। সপ্তদশ শতাব্দীর যাজক সংঘগুলো – লাজারিষ্ট, সালপিসিয়ান প্রভৃতি সংঘ – সাগরপারে তাদের কিছু সভ্য প্রেরণ করে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'প্যারিস বিদেশী মিশন সোসাইটি" নামক সংঘটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস বিস্তার সংসদের প্রেরণকার্য ক্ষেত্রসমূহের সেবায় এর যাজকদের নিয়োজিত ক'রে থাকে।

৩। খ্রীষ্টানোচিত বিবেক ও উপনিবেশন

বিজেতা ও যাদের জাহাজে চড়ে তারা ভ্রমণ করতেন সেই বণিকদের উপর নির্ভরশীল প্রেরণকর্মীগণ অচিরেই দেশ দখল ও উপনিবেশন সংশ্লিষ্ট মারাত্মক সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন।

ঔপনিবেশিক শোষণের অপব্যবহার

ঔপনিবেশিকরা ইউরোপকে ত্যাগ ক'রে সমুদ্রের অপর পারে বা বিদেশে যেত অঢেল অর্থ উপার্জনে, সোনা, মশলাপাতি ও আরও পরে চিনি ও কফির খোঁজে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (আমেরিকা) বিজয়ই যে শুধু যুদ্ধে ইণ্ডিয়ানদের ব্যাপক মৃত্যুর

কারণ ছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে ইউরোপ থেকে ব'য়ে আনা রোগ-ব্যাধি (যেমন – হাম, গুটি বসন্ত) এবং খনিগুলোতে ইণ্ডিয়ানদের বাধ্যতামূলক কঠোর পরিশ্রমও অপমৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। এর বিরূপ ফল দাঁড়াল এই যে, সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এন্টিলেসের আদিবাসীরা
[১৮৮] পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্পেনীয়রা ভূমি ও জনগোষ্ঠীকে (encomienda নামে অভিহিত একটি পদ্ধতি অনুসারে) বিভক্ত করল এবং এটা ছিল ইণ্ডিয়ানদের জন্য ছদ্মাবরণে এক ধরনের দাসবৃত্তি। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে ডমিনিকীয় মন্তেসিনোস ইণ্ডিয়ানদের শোষণকে নিন্দা ক'রে একটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। এই ধর্মোপদেশ ঔপনিবেশিকদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে। তারা ব্যাপারটি মিমাংসার জন্য স্পেনীয় আদালতে তোলে। বার্গসের বিধান (১৫১২)

[১৮৮] স্পেনীয় উপনিবেশগুলোতে ন্যায্যতার জন্য লড়াই

বার্তোলোমে দ্য লাস কাসাস্ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৫৬৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইন্ডিজে (আমেরিকায়) ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটিতে তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে আন্তোন মন্তেসিনোস নামে একজন ডমিনিকীয় ১৫১১ সালে হিস্পানিয়োলার (সেন্ট ডমিনিক) ঔপনিবেশিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ধর্মোপদেশের মধ্য দিয়ে ন্যায্যতার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন।

মন্তেসিনোর ধর্মোপদেশ

"আপনারা সকলেই মারাত্মক পাপের অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এই নির্দোষ নিরীহ মানুষদের প্রতি আপনারা যে নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করছেন তার কারণে আপনারা এই অবস্থায় আছেন ও এর মধ্যেই আপনাদের মৃত্যু হবে। এ সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের এমন নির্মম ও ভয়ানক দাসত্বের মধ্যে আবদ্ধ রাখার আপনাদের কি অধিকার আছে ? তাদের নিজ দেশে নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে বসবাস করছে যে লোকেরা, তাদের উপর এসব জঘন্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া, খুন করা ও নজীরবিহীন হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে এমন অকল্পনীয় সংখ্যায় তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার অধিকার আপনাদের কে দিল ? আপনারা তাদের কাছ থেকে অত্যধিক পরিশ্রম আদায় করেন। অথচ আপনারা তাদের প্রয়োজনীয় খাবার না দিয়ে এবং মারাত্মকভাবে অসুখ-বিসুখে জর্জরিত হলে তাদের ঠিকমত সেবা-যত্ন না করে, কিভাবেই বা আপনারা তাদের এভাবে উৎপীড়ন করতে পারেন, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম চাপিয়ে দিয়ে তাদের পরিশ্রান্ত করতে পারেন ? আপনাদের দৈনন্দিন সোনা আহরণ ও স্তুপীকৃত করার উদ্দেশ্যেই আপনারা তাদের হত্যা করছেন – এ কথা বলাই কি অধিকতর ন্যায়সঙ্গত না ? তারা যাতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, সে ব্যাপারে আপনারা কি করছেন ? এই লোকেরা কি মানুষ নয় ? তাদের কি আত্মা নেই ? তাদের কি জ্ঞানবুদ্ধি নেই ? তাদেরকে আপনারা নিজের মত ভালবাসতে কি বাধ্য নন ?"

Codex Vindobonensis Aztec, ষোড়শ শতাব্দীর কাছাকাছি; চিত্র লিখন

[১৮৯] একদিনে কেউ প্রতিমাকে উচ্ছেদ করে না

"ক্রুশমূর্তি স্থাপন ও এর প্রতি ইণ্ডিয়ানদের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো একটি ভালো কাজ যদি কেউ তাদেরকে এ সমস্ত কাজে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা ভালোমত বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু যদি তার পর্যাপ্ত সময় হাতে না থাকে, কিংবা সে যদি তাদের ভাষায় কথা বলতে না পারে, তবে এটা হবে নিরর্থক ও ভাসা ভাসা, কারণ তাহলে ইণ্ডিয়ানরা মনে করতে পারে যে, সে তাদেরকে একটি নতুন প্রতিমা দিচ্ছে যা খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরেরই রূপ দেখায়। এভাবে সে এক খণ্ড কাঠকে দেবতাজ্ঞানে তাদেরকে ভক্তি করতে উৎসাহিত করবে, যা মূর্তিপূজারই নামান্তর।

যে পথে এগুনো সবচেয়ে নিরাপদ, একমাত্র যে নীতিটি খ্রীষ্টানদের উচিত মেনে চলা যখন তারা বিধর্মীদের দেশে অবস্থান করে, তা হচ্ছে – সৎকাজের মাধ্যমে এমনভাবে সু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যাতে আমাদের ত্রাণকর্তার কথা অনুযায়ী, 'তোমাদের সৎ কাজ দেখে তারা তোমাদের পিতার প্রশংসা ও গৌরব করতে পারে' এবং তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, যে ঈশ্বরের এমন উপাসকমণ্ডলী রয়েছে, তিনি উত্তম ও সত্য না হয়ে পারেন না।"

লাস কাসাস, ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত।

encomienda-এর ব্যবস্থা বহাল রাখে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, ইণ্ডিয়ানদের প্রতি স্বাধীন মানুষের মতোই আচরণ করতে হবে এবং মনিবরা তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের জন্যও সচেষ্ট থাকবে।

বার্তলোমে দ্য লাস কাসাস

পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন না হলেও ইণ্ডিয়ানদের প্রতি ন্যায়বিচারের সংগ্রাম কিন্তু বার্তলোমে দ্য লাস কাসাস (১৪৭৪–১৫৫৫) নামে একজন উপনিবেশিক যাজকের দ্বারা জোরদার হয়ে এগিয়ে চলে। তিনি নিজেও ইণ্ডিয়ানদের শোষণ করেছেন এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মন পরিবর্তন' করেন। শান্তিপূর্ণ উপনিবেশনে বাধাপ্রাপ্তির পর তিনি একজন ডমিনিকীয় যাজক হয়ে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন রাজাকে ecomienda-এর ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে এবং শান্তিপূর্ণ মঙ্গলবাণী প্রচারের ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর কাজে। মনে হয় তাঁর বদৌলতেই পোপ তৃতীয় পল তাঁর Sublimis Deus (1537) নামক অনুশাসনপত্রে স্বীকার করেছেন যে, "ইণ্ডিয়ানরাও স্বাধীন মানুষ এবং ভালবাসা দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করতে হবে"। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাস কাসাস তাঁর "ইণ্ডিয়ানদের [১৮৯]
ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা" নামক লেখায় যুদ্ধজয়ের বিভীষিকাগুলো চিত্রিত করেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস যে নতুন আইন (১৫৪২)-এর মাধ্যমে encomienda বাতিল করেছিলেন, তার মূলে পরোক্ষ অনুপ্রেরণারূপে কাজ করেছিলেন লাস কাসাস। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুয়াতেমালার অন্তর্গত চিয়াপার ধর্মপাল হলে ঔপনিবেশিকদের বৈরিতার সম্মুখীন হন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে চিরদিনের জন্য ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে ফিরে আসতে হয়। একই সময়ে স্পেনে ফ্রান্সেস্কো দ্য ভিতোরিয়া নামে একজন ঐশতত্ত্ববিদ সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ইণ্ডিয়ানবিষয়ক অভিজ্ঞতা এবং আইনের অধিকার' শীর্ষক পুস্তকে স্পেনের উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেন। বিজেতাদের আচরণের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। লাস কাসাস মনে করতেন দেশ দখলের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু পক্ষে ও বিপক্ষে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হল এবং ফলাফল হ'ল অনিশ্চিত।

লাস কাসাস ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের চালিত লড়াইগুলো খ্রীষ্টীয় বিবেকের মর্যাদা প্রকাশ করে। "মানুষের অধিকার" সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে এটা ছিল একটি পর্যায়। যাই হোক, অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল সত্য, তবে শোষণ কিন্তু চলতেই থাকল, কেননা নিয়ম ও আচার-ব্যবহার পরস্পর-বিরোধী ছিল। রাজা জনহিতকর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন বটে কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি এটা ভাল করেই জানতেন যে, উপনিবেশগুলো দেশের জন্য বয়ে আনত প্রচুর রাজস্ব এবং ঔপনিবেশিকরা অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে স্পেনে যে মাঝারি মানের জীবন ধারণ করতেন, শুধুমাত্র তা-ই বজায় রাখার জন্য সমুদ্রের সমস্ত বিপদ-আপদকে তুচ্ছ ক'রে সমুদ্রযাত্রা করতেন না। ইণ্ডিয়ানদেরকে সোনার খনিতে কাজ ক'রে সোনা আহরণ করতেই হয় আর এই কাজ করতে গিয়ে তাদের অনেককেই জীবন দিতে হয়। এভাবে তাদের মৃত্যুবরণ চলতেই থাকে।

দাসত্ব

মৃত ইণ্ডিয়ানদের স্থলে নতুন শ্রমিককে বসানো মানেই ছিল দাস ব্যবসার বিস্তার ঘটানো। দাসপ্রথাটি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত পাশ্চাত্য থেকে অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে মধ্যযুগে তুর্কীদের হাতে বন্দীদের দাস বানানো হত এবং এরই প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তুর্কী বন্দীদেরকেও বিক্রি করা হত। এ থেকেই ধর্মযুদ্ধের সময় বন্দীকৃত কয়েদীদেরকে দাসে পরিণত করা চলে – এ ধারণার উৎপত্তি লাভ করেছিল। স্পেনীয় উপদ্বীপের এ সমস্ত দাসদের একটি ছোট্ট কেন্দ্র ছিল। আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকের একটি বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ব্যবসার সূত্রপাত ঘটায়। আফ্রিকার উপকূল হতে এ সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের পাওয়া যেত। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত এই ব্যবসা চলতে থাকে। এভাবেই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ থেকে দুই কোটির মত কৃষ্ণকায় মানুষদের আনা হয়েছিল।

দাসপ্রথা ও এর ব্যবসার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য এরিস্টটলের যুক্তিতর্কগুলো পুনরায় কাজে লাগানো হয়। কারণ এরিস্টটল মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মতে এমন মানব-শ্রেণী আছে যারা স্বভাবতই দাস। হামের পুত্রদের অভিশাপের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় (দ্রঃ আদিপুস্তক ৯:৫ যা আফ্রিকাবাসীদেরকেই ইঙ্গিত করে বলে ধরে নেওয়া হয়)। মোট কথা উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল বিস্তর কপটতা।

অর্থনীতির মঙ্গলের জন্য দাসপ্রথা ছিল একটি অপরিহার্য মন্দ। অধিকন্তু, এমন কথাও বলা হয়েছে, দাসপ্রথা কৃষ্ণকায়দেরকে খ্রীষ্টধর্মের সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল! প্রেরণকর্মীগণও দাস ব্যবসায় অংশ নিতেন এবং তাদেরও নিজস্ব দাস-দাসী ছিল। কৃষ্ণকায়গণ তাদের পক্ষে সোচ্চার হবার জন্য কোন দ্য লাস কাসাসকে পাননি বরং শুধুমাত্র যেজুইট পিয়েরে ক্লাভের-এর মত পরোপকারী ব্যক্তিগণ যারা সপ্তদশ শতাব্দীতে কলম্বিয়াতে কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্দশার উন্নতিকল্পে একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

বিভিন্ন কৃষ্টির সম্মিলন

বিজেতা ও প্রেরণকর্মীগণ এমন সব সভ্যতা ও কৃষ্টিকে নৃশংসভাবে মোকাবিলা করেন যাদের সম্বন্ধে তারা মোটেই কিছু জানতেন না। প্রাথমিক সুখোচ্ছ্বাসের পরপরই কিছু সংখ্যক স্থানীয় রীতিনীতি, যেমন – আজ্‌তেকদের নরবলির সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে, যা তাদের গভীরভাবে মর্মাহত করে। উপরন্তু, প্রেরণকর্মীগণ স্থানীয় লোকদের কাছে যে খ্রীষ্টধর্মকে তুলে ধরছিলেন, তা ছিল পনেরশ' বছর ধরে ইউরোপীয় কৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফসল। তারা খ্রীষ্টবাণীকে এর কৃষ্টিগত মোড়ক থেকে ঠিকমত আলাদা করতে পারেনি। এতে দ্বৈত মনোভাবের সূত্রপাত ঘটায়।

'বিশুদ্ধ সঞ্চালন' পদ্ধতিটি দেশীয় যত ধর্ম নির্মূলের কাজে নিয়োজিত ছিল, কারণ দেশীয় ধর্মগুলোকে শয়তানের কারসাজিরূপে দেখা হত। কিন্তু প্রাচীন ধর্মসমূহ ধ্বংস করা মানে স্থানীয় কৃষ্টি ও সমাজগুলোকে ধ্বংস করার সামিল । ধর্মান্তরিতদের কম-বেশী খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ইউরোপীয় কৃষ্টিকে গ্রহণ করতে হত।

অপরদিকে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিগুলো অদ্ভুত ধরনের হলেও এগুলোকে যথার্থভাবে বুঝার জন্য একটা আগ্রহ ঔপনিবেশিকদের ছিল। লাস কাসাস ইণ্ডিয়ান কৃষ্টি সংস্কৃতিকে কদর করতে শিখেছিলেন। তাই তিনি অন্যদেরকেও এগুলোকে শ্রদ্ধা করতে বলতেন। মেক্সিকোতে ফ্রান্সিস্কীয় সাহাগুণের (১৫০০-১৫৯০) মত প্রেরণকর্মীগণ নৃবিজ্ঞানীরূপে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ও চীনে যেজুইটগণ প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মহত্ত্ব ও বিশালতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং বিস্মিত হয়ে ভাবতেন এগুলোকে ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা। এসব সমস্যা কখনও পুরোপুরিভাবে সমাধান করা যায়নি এবং তা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেরণকার্যের সংকটের অন্যতম কারণও হয়ে উঠেছিল।

॥ ২ ॥ মহাদেশগুলোর ওপারে

১। আফ্রিকা

ধর্মযুদ্ধের ধারাবাহিকতাস্বরূপ সিউটা (১৪১৫) হতে উত্তমাশা অন্তরীপ (১৪৮৬) ও মোজাম্বিক (১৪৯৮) পর্যন্ত আফ্রিকার উপকূল বরাবর পর্তুগীজ সম্প্রসারণ ছিল আফ্রিকায় সর্বপ্রথম মঙ্গলবাণী প্রচারের শুভ সূচনা। কয়েক বছর ধরে কঙ্গো রাজ্য (জায়ের বা কঙ্গো নদীর ভাটির এলাকার দক্ষিণাঞ্চল) বিপুল আশার জন্ম দেয়। পর্তুগীজ প্রেরণকর্মীগণ সেখানকার রাজাকে ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং "একজন অত্যন্ত খ্রীষ্টীয় মনোভাবাপন্ন রাজা"
[১৯০] প্রথম আলফন্সোর (১৫০৬-১৫৪৫) শাসনাধীনে কঙ্গোলিজ মণ্ডলী বিকশিত হয়। রাজা পর্তুগালের আদলে তাঁর রাজ্য সংগঠিত করেন এবং তাঁর পুত্র প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ যিনি একজন ধর্মপাল হয়েছিলেন (১৫২১)। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী সালভাদর একজন ধর্মপালের বাসভবন হয়ে ওঠে। কঙ্গোর রাজাগণ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। একজন কঙ্গোবাসী রাষ্ট্রদূত ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজরা রাজা প্রথম আন্তনিও-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কারণ রাজা তাদের খনি অনুসন্ধানের অধিকার দিতে

অস্বীকার করেছিলেন। যুদ্ধে রাজা পরাজিত হলে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে শিরোচ্ছেদ করা হয়। পর্তুগীজরা এঙ্গোলার চেয়ে এ দেশের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম আগ্রহী ছিল। মঙ্গলবাণী প্রচারকার্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। বিশ্বাসবিস্তার [১৯১]
দপ্তর সেখানে কাপুচিনদের প্রেরণ করে – এঁদের অনেকেই তাঁদের বিভিন্ন কার্যবিবরণী রেখে গেছেন। বিয়াত্রিস নাম্নী একজন কঙ্গোলিজ মহিলার অনুপ্রেরণাধীনে আন্তনিয়োবাদ নামক প্রথম একটি আফ্রিকান-খ্রীষ্টান সমন্বয়ের আবির্ভাব ঘটে এবং তা নির্মমভাবে দমনও করা হয়। বিয়াত্রিসকে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুড়িয়ে মারা হয়।

ঔপনিবেশিক উদ্যোগের সবচেয়ে কদর্য রূপ ছিল দাস ব্যবসা। এ সময় এই দাস-ব্যবসা ও প্রেরণকার্য মঙ্গলবাণী-ঘোষণার সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত রূপ তুলে ধরে।

সপ্তদশ শতাব্দীটা ছিল ফরাসী প্রেরণকর্মীদের আসার পালা। আইভরি কোস্টের আসিনিয়া রাজার এক পুত্র

আফ্রিকায় দাসত্ব-প্রথা, বাণিজ্য ও মঙ্গলবাণী প্রচার

বাণিজ্য এবং বিশেষভাবে প্রেরণকর্মীদের দ্বারা সমর্থিত কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস-ব্যবসা আফ্রিকায় মঙ্গলবার্তা প্রচারকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ক'রে তুলেছিল। কঙ্গোরাজ এ ব্যাপারে সচেতন থাকলেও কাপুচিন প্রেরণকর্মীগণ কিন্তু সচেতন ছিলেন না।

[১৯০] পর্তুগালের রাজার নিকট কঙ্গোর রাজা প্রথম আলফন্সোর (১৫০৬-১৫৪৩) অভিযোগ

"মহারাজের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, যাদের একমাত্র ভাবনা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্যায়ভাবে তারা যাদেরকে অর্জন করেছেন তাদের বিক্রয় করা, যারা তাদের ব্যবসা দ্বারা আমাদের রাজ্য ও যে ধর্ম নাকি বহু বছর ধরে আপনার পূর্বসূরীদের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই খ্রীষ্টধর্মকে ধ্বংস করা, তারা আমাদের সম্বন্ধে যে সব বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে আপনি বিশ্বাস করবেন না। যারা বিশ্বাসের এই মহাদান লাভ করেছে, আমরা চাই তাদের জন্য তা সুরক্ষা করতে। কিন্তু তা করা এখানে কঠিন কেননা ইউরোপীয় জিনিষ-পত্র সহজ-সরল ও অজ্ঞ মানুষদের উপর এমন আকর্ষণ বিস্তার করে যে সেগুলোকে পাবার জন্য তারা ঈশ্বরকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করছে। এর প্রতিকার হচ্ছে – এই অপব্যবসা রোধ করা, কেননা যারা এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের জন্য এই ব্যবসা শয়তানেরই পাতা একটি ফাঁদস্বরূপ। ধনলিপ্সা ও বিষয়-সম্পত্তির লোভ এই দেশের মানুষদের তাদের স্বদেশীদের চুরি করার অপকর্মে ঠেলে দিচ্ছে। খ্রীষ্টান– অ-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে তাদের ও আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরও চুরি করতে তারা দ্বিধা করে না। তারা এদেরকে ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করে, বিক্রি করে ও অন্য কিছুর সঙ্গে বিনিময় করে। এই অনাচার এত বিশাল যে, আমরা এটাকে আঘাত না হেনে, চরম আঘাত না হেনে এর সংশোধন করতে পারব না।"

[১৯১] কঙ্গোতে ফ্রা লুকা কালতানিসেত্তা নামক একজন কাপুচিনের প্রেরণক্ষেত্র বিষয়ক সাময়িকী

"১৪ই জুলাই ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাম্বার উদ্দেশ্যে প্রচারযাত্রাকালে একজন বণিক দুগ্ধপোষ্য একটি ছোট্ট শিশুসহ একজন দাসী ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। তার মনিবকে এই বণিকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে এই স্ত্রীলোক যথার্থই বুঝে ফেলল সে বিক্রি হতে যাচ্ছে। সে তার বুকের শিশুটি তুলে নিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একটি পাথরের উপর ছুঁড়ে মারল। তারপর সে একটি লোকের হাত থেকে কয়েকটি তীর কেড়ে নিয়ে সেগুলো নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিল; আর এভাবেই সে নিরাশার মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে দীক্ষাস্নান না পেয়েই মারা গেল। এই প্রেরণযাত্রাকালে বস্তুভক্তিকারীদের বিরুদ্ধে করার ও বলার আমার অনেক কিছু ছিল।

(১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমি জঞ্জো পৌত্তলিকদের (বা বস্তুভক্তিকারীদের) যাজকদের নির্মিত একটি বেদী ধ্বংস করে দিই। এই বেদীটি ছিল পশুর মাথার খুলি বসানো-খুঁটি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি স্থান। খুঁটির মাথায় অবস্থিত খুলিগুলোর মধ্যে একটি ছিল বড় আর চারটি ছোট। এই বস্তুগুলো আমি ধ্বংস করায় কিছু সংখ্যক মহিলা অভিযোগ করল। তারা আমাকে বলল ঃ 'ফাদার যখন খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন, তখন কি তিনি তার প্রথা পালন করেন না ? তদ্রূপ আমরাও আমাদের নিজস্ব কিছু প্রথা রাখতে চাই।'

(১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) আমার প্রথম সাত বছরকাল চলাকালে আমি সর্বমোট ২০,৯৮১টি দীক্ষাস্নান প্রদান করেছি ও ১১০টি বিবাহ আশীর্বাদ দান করেছি।"

লুকা দ্য কালতানিসেত্তা, Diaire Congolais, (1690-1701)।

১৬৯১ সালে প্যারিসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। লাজারিস্ট ধর্মসংঘীগণ মাদাগাস্কারে উপনিবেশ স্থাপনে (১৬৪৮-১৬৭৪) সফলকাম হননি। স্পিরিট ফাদারগণ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সেনেগালে একটি প্রেরণক্ষেত্র বা মিশন শুরু করেন। রিইউনিয়ন ও মরিসাসে বিভিন্ন যাজক অন্যস্থান হতে উপনিবেশে আগত বসবাসকারী ও দাসদের মাঝে কাজ করেন।

২। আমেরিকাদ্বয়

ল্যাটিন আমেরিকা

স্পেন সরকার মণ্ডলী সংগঠনের কাজটা আন্তরিকতার সঙ্গে নেন। ১৫১১ হতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্পেন সরকার চৌত্রিশ জন ধর্মপাল নিযুক্ত করেন। রাজধানীর বিভিন্ন ধর্মসংঘগুলো হতে সচরাচর মনোনীত ধর্মপালগণ ছিলেন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। আবার এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকজন ছিলেন, যেমন জুমারাগা নামে একজন ফ্রান্সিস্কীয় যিনি মেক্সিকোর ধর্মপাল ছিলেন ১৫২৮ হতে ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং মগরেভজোর তরিবি যিনি লিমার ধর্মপাল ছিলেন ১৫৮১ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। শেষোক্ত ধর্মপাল পরে একজন সাধু বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। এ সকল ধর্মপাল তাঁদের মণ্ডলীগুলোকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশে অসংখ্য প্রাদেশিক মহাসভা ও ধর্মপ্রদেশীয় সংসদ আহ্বান করেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় মেক্সিকো ও লিমাতে। কিন্তু দেশের কর্তৃপক্ষগণ সময় সময় এ সমস্ত সভার সমর্থন ও অনুমোদন দিতে অস্বীকার করতেন।

পালকীয় প্রেরণমূলক কার্য

প্রথম প্রথম মঙ্গলবাণী প্রচারকার্যটি প্রায়ই ছিল বিশ্বাস ও শক্তি প্রদর্শন ঃ যেমন – ক্রুশ স্থাপন করা, যত প্রতিমা ধ্বংস করা ও জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ইনকা ঐতিহ্যকে মর্যাদা না দেওয়ার প্রয়াসে ফ্রান্সিসকো দ্য তোলেদো তুপাক-আমারু নামে ইনকা রাজবংশের একজনকে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিমা পূজার ঐশশাস্তির লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ধর্মের বাকি সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে নস্যাৎ করা। এটা ছিল বাস্তবিকই জঞ্জাল সাফ করার সামিল।

তবে প্রেরণকর্মীগণ স্থানীয় ভাষাগুলো (মেক্সিকোতে নাহুয়াত ও পেরুতে কোচুয়া) শেখার ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। তারাই স্থানীয় ভাষায় ধর্মসার, ধর্মোপদেশ ও নাটক-নাটিকা রচনা করেন এবং প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে নিজেরাই ইতিহাসবেত্তা হয়ে উঠেছিলেন। তবে স্পেনের রাজা তাদের জাতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ ধ্বংস করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

যদিও দীক্ষাস্নান তড়িঘড়ি ক'রে দেয়া হত কিন্তু খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারের ব্যাপারে প্রেরণকর্মীগণ নিজেদের অনেকটা হিসেবী বলে প্রতিপন্ন করেন। ইণ্ডিয়ানদের সচরাচর যাজকপদে অভিষিক্ত করা হত না। স্পেন দেশে

Teotihuacan, মেক্সিকো

[১৯২] উত্তম মেষপালক ঃ পেরুর ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে কোচুয়া ভাষায় প্রদত্ত একটি ধর্মোপদেশ (১৬৪৬)

পেরুতে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণকারী ফ্রান্সিসকো দাভিলা (১৫৭৩-১৬৪৭) ছিলেন একজন স্পেন দেশীয় ধর্মযাজক। পেরুর ইণ্ডিয়ানদের নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের প্রতি, যেভাবে তারা বিধ্বস্ত হচ্ছিল তার প্রতি, ঔপনিবেশিক বিজয় দ্বারা সৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ও তাদের ঐতিহ্যগত সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। কোচুয়া নামক একটি ইণ্ডিয়ান ভাষায় প্রদত্ত নিম্নলিখিত ধর্মোপদেশে দেখা যাচ্ছে একদিকে কেমন ক'রে তিনি শুধু তাঁর মেষপালকে ঠিকমত বুঝতে পারেন, কিন্তু অপর দিকে কেমন ক'রে তিনি ইণ্ডিয়ানদের দুর্গতিকে বিধাতা ঈশ্বরের কথা তুলে ধরে তাদের অবস্থা ঐশ পরিকল্পনাজনিত বলে দেখাতে চেষ্টা করেন, যা বর্তমানকালের একজন পাঠকের কাছে বেদনাদায়ক হতে পারে।

"আমি লামাদের উত্তম পালক, এমনই একজন পালক যার রয়েছে একটি বিশাল হৃদয়। তার লামাদের জন্য তার কোন মৃত্যুভয় নেই। বেতনভুক পালক এবং যার পশুরা, তার লামারা তার নিজের নয়, সে কোন পুমাকে লাফাতে দেখলেই যত তাড়াতাড়ি পারে দৌড়ে পালায়। পুমা তখন কোন লামাকে পাকড়াও করে ও অন্যগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এমনটা হয় কারণ পালকটি যে বেতনভুক, কারণ পশুগুলো যে তার নিজের নয়। আমিই উত্তম পালক যে তার পশুদের চিনে, আর পশুরাও আমাকে চিনে।

কিন্তু সে যখন পালক হয়ে থাকে, তখন তার লামারা অর্থাৎ তার পশুরা কে ও কি ? আমরাই, এবং আমরাই মাত্র সেই লামা, সেই পশু। সকল মানুষ, সমস্ত নারী ও পুরুষই যীশু খ্রীষ্টের লামা।

হতে পারে আপনাদের কেউ মনে মনে বলতে পারেন ঃ 'ফাদার, আমরা ইণ্ডিয়ানরা তো শ্বেতকায়দের মত নই; আমাদের উৎপত্তি ভিন্ন, আমাদের রয়েছে একটি ভিন্ন আদল, তাই আমরা ঈশ্বরের লামা নই এবং শ্বেতকায়দের ঈশ্বর তো ইণ্ডিয়ানদের ঈশ্বর নন। আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় হতেই আমাদের রয়েছে নিজস্ব হুয়াক্কা অর্থাৎ আমাদের যতো প্রতিমা ও আমাদের উমু অর্থাৎ আমাদের যাজকগণ।

অধিকন্তু, শ্বেতকায়রা এখানে আসার আগে রুনারা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানরা জঙ্গলে পর্বতমালায় বিপুলভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। ভুট্টা, মিষ্টি আলু, কিনুয়া , ওক্কা , লামা, পশমযুক্ত পশু – এ সমস্ত খাদ্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

সেই সময় চোর বলতে কোন কিছু ছিল না ... কিন্তু শ্বেতকায়রা এলে সমস্ত রুনা চোরে পরিণত হয়। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো আমরা ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতকায়দের থেকে আলাদা; আমরা দু'পক্ষ, একই নই। ফলে আমরা বুঝতে পারছি না কিভাবে আমরা লামা, যীশু খ্রীষ্টের পশু হতে পারি। এ কারণেই আমরা দ্বিতীয় পক্ষ, আমরা ইণ্ডিয়ানরা বাহ্যতঃ ও দৃশ্যতঃ মাত্র খ্রীষ্টান; আমরা খ্রীষ্টযাগে যোগদানের, ধর্মোপদেশ শ্রবণের, পাপস্বীকার করার কেবলই ভান করি, কারণ আমরা যে পাদ্রিকে, শাসনকারীকে ভয় করি।

আমাদের অন্তঃকরণ কেবলই আমাদের হুয়াক্কার কথা ভাবে, কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। আর এখন দেখুন আমাদের রয়েছে যত দুঃখ-কষ্ট এবং যে সকল গ্রাম একদিন খ্রীষ্টান হয়েছে, তা সব বিলুপ্ত হয়েছে। এমন কি তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে, আমরা তাদের কথা জানিও না। শ্বেতকায়রা আমাদের সমস্ত শস্যক্ষেত নিয়ে নিয়েছে। চরকায় সূতা কাটা, কাপড় বোনা, পশমের মোটা চাদর বা কম্বল তৈরী করা ইত্যাদি শাসনকারীর জন্য করি শুধু।'

বৎস আমার, তুমি যে এ সমস্ত কথা বললে, এজন্য আমি আনন্দিত এবং তা শুনে আমি খুশি। মনে আমার কিছুটা আনন্দ আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ব্যথা ও দুঃখও পাচ্ছি। কেন আমি আনন্দিত ? কারণ আমি যে তোমাদের মন বুঝি, তোমাদের ভাবনার কথা জানি, আর তুমি পীড়িত বলে আমি তোমার পরিচর্যা করতে পারি। আর আমার মনে কেন দুঃখ ? কারণ আজও পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করেনি, ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেনি যদিও বা তারা এত অসংখ্য ধর্মোপদেশ, এত বেশী ধর্মশিক্ষা পেয়েছে ...

আমার কথায় কান দাও আর শোনো। যা-কিছুই ঘটে, জীবন ও মৃত্যু, সংখ্যাবৃদ্ধি ও বিলোপ, সুস্বাস্থ্য ও জরা-ব্যাধি – ইহকাল ও পরকালের সমস্তই ঘটে একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। ফলে তাঁর ইচ্ছা হলে এক জাতি অন্য জাতির উপর বিজয়ী হয় ও কর্তৃত্ব করে; অন্য সময় বিজেতারা বিজিততে পরিণত হয়। কিন্তু অনেকবার তিনি যদি বহু শহর ও অনেক মানুষ অধ্যুষিত কোন প্রদেশ নিশ্চিহ্ন করেন, আমাদের তখন বুঝতে হবে এমনটা ঘটেছে তারা পাপ করেছে বলেই।

তাদের পূর্বেকার দোষ-ত্রুটির কারণেই ঈশ্বর ইনকাদের শাস্তি দিতে শুরু করেছেন – তাদের ও তাদের সঙ্গে রুনাদেরও মেরে ফেলছেন। আর ঈশ্বর তো নিছক দৈবক্রমে তা করেননি; তিনি তা করেছেন তাঁর সুবিশাল, অনতিক্রমণীয় প্রজ্ঞায়। শ্বেতকায়রা ঈশ্বরের নিযুক্ত প্রতিনিধি হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই তারা এসেছেন ...।

অন্যথায়, প্রকৃত ঈশ্বরকে পূজা না করার দায়ে এবং অন্যান্য দোষ-ত্রুটির জন্য সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের আত্মা নরকেই যেত ...।

আমরা সকলেই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছি; আমরা যীশু খ্রীষ্টেরই জীব। তিনিই আমাদের প্রকৃত পালক যিনি আমাদের তাঁর বাণী ভোজন করতে দিয়েছেন যাতে আমরা তা দ্বারা মুক্তি লাভ করি এবং যাতে তিনি ঊর্দ্ধলোকে, সেই স্বর্ণময় আবেষ্টনীতে, সেই পরম দেশে আমাদের নিয়ে যেতে পারেন যেখানে কাউকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে না। পক্ষান্তরে, যে জীবন তোমরা এখন যাপন করছ, সেখানে সেই অভিশপ্ত শয়তান, সেই মিথ্যাচারী, যে কিনা তোমাদের পালক, সে তোমাদের তার মিথ্যায় ভুলিয়ে নরক যন্ত্রণায় নিয়ে যায় ... সেই শয়তানের উপর, সেই কুহকী, সেই ডাইনীর উপর থু থু মেরে শুধুমাত্র ঈশ্বরকে, যীশু খ্রীষ্টকে মেনে চল ...।"

প্রচলিত ধর্মসারের উপর ভিত্তি করে প্রণীত একটি ধর্মসারকে সাজানো হয় দর্শন ও শ্রবণ সহায়ক চমৎকার উপকরণসহ, যেমন – ছবি, গান-বাজনা, প্রতীকী/সাংকেতিক ক্রিয়াবলী।

[১৯২] দেশীয় ভাষায় রচিত কিছু কিছু ধর্মোপদেশে দেশীয় লোকদের মন-মানসিকতা যথার্থ বিবেচনা করার প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু একই সময় বিধাতা-ঈশ্বরের কথা তুলে ধরে তারা খ্রীষ্টধর্ম ও স্প্যানিশদের পক্ষপাতী একটি ধর্মীয় তর্কবিদ্যা খাড়া করেন এবং ইণ্ডিয়ানদের ভয় করতে শিখিয়ে সবকিছু সহ্য ক'রে গ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

গুয়ারানিদের খ্রীষ্টীয় ভাবাপন্ন কমিউনিষ্ট ধরনের প্রজাতন্ত্র

পারানা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে – এই তিনটি নদী এলাকায় যেজুইটগণ যাযাবর গোত্রগুলোকে মঙ্গলবাণী গ্রহণ করানো ও শান্তকরণের কাজ শুরু করেন। তারা উক্ত গোত্রগুলোকে reductions অর্থাৎ ঔপনিবেশিকদের শোষণ হতে সংরক্ষিত আদিবাসীদের খ্রীষ্টান গ্রামগুলোতে বসতি স্থাপন করান। সর্বপ্রথম এরূপ বসতি স্থাপিত হয় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। ৫,০০,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রায় ত্রিশটি গ্রাম ছিল তখন।

সংঘবদ্ধ জীবনযাপন পুরাদস্তুর খ্রীষ্টীয় ভিত্তির উপর সুসংগঠিত হয়েছিল। প্রতি সংরক্ষিত গ্রাম দুই বা তিনজন যেজুইটের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল; প্যারাগুয়েতে অবস্থিত যেজুইট সংঘের পরিচালক বিভিন্ন সংরক্ষিত গ্রামগুলোর মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করতেন। সংরক্ষিত গ্রামগুলোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না যা হস্তান্তর করা যায়। সেখানে সব কিছুই ছিল সবার। প্যারাগুয়েকে তাই কল্পরাজ্যের রূপায়ন বলে মনে হয়েছিল।

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে সীমান্তের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষিত গ্রামগুলো স্পেনীয়দের নিয়ন্ত্রণ থেকে পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। গুয়ারানিরা কিছুকাল এ অবস্থায় চলতে থাকে। কিন্তু ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যেজুইটদের সংঘ বাতিলের ঘোষণাটি ছিল সংরক্ষিত গ্রামগুলোর উপর চরম আঘাতের সামিল। ফলে সংরক্ষিত গ্রামগুলোর সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। যেজুইটগণ তাঁদের অধীনস্থদের প্রয়োজন মিটিয়ে ছিলেন কিন্তু কোন রকম দায়িত্ব না দিয়ে পিতৃসুলভ পন্থায় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছিলেন আর তাই তো তারা লোকদের সত্যিকার অর্থে স্বতন্ত্র ও দায়িত্বশীল হতে প্রস্তুত করেননি।

সাধু ডমিনিকের সম্প্রদায়ের ব্রাদার

সাধু ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়ের ব্রাদার

ফরাসী আমেরিকা

কানাডায় মঙ্গলবাণী প্রচার শুরু হয়েছিল চ্যামপ্লেইন কর্তৃক ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুইবেকের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে। এর ফলশ্রুতিতে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি ফ্রান্সিস্কানদের আগমন হয়। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার প্রচারক্ষেত্রটি জেজুইটদের নিকট ন্যস্ত করা হয়। এই জেজুইটগণ যাযাবর লোকেরা যেখানে যেত, তাদের সঙ্গে তারাও সেখানে যেতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে কোথাও স্থায়ী বসতি স্থাপনে বাধ্য করতেন। এ প্রচেষ্টায় তারা হুরনদের সঙ্গে কিছুটা সফলকাম হন বটে, কিন্তু ইরোকুইদের কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন, কেননা ইরোকুইরা ইংরেজদের সমর্থন লাভ করেছিল।

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কুইবেকে সর্বপ্রথম উরসুলাইন সংঘের বাণীপ্রচারক সন্ন্যাসিবনীগণ বসতি স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে দেহধারণভক্ত মেরী(১৫৯৯–১৬৭২) ছিলেন সর্বাধিক সুপরিচিত; তিনি মরমী লেখিকারূপেও সবিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন।

সালপিসিয়ানগণ মন্ট্রিয়লে বসতি গাড়েন ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। বেশ কয়েকজন প্রেরণকর্মীকে সাক্ষ্যমরণ বরণ করতেও

বিজয়লাভ ঃ
তোমরা কি
এই সোনা খাও?
আমরা খাই।

মন্দ পাপস্বীকার

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে
পেরুতে ধর্মপল্লীর জীবন ঃ
জোরপূর্বক বিবাহ

ধর্মশিক্ষার সময়
ছেলেমেয়েদের শাসন

Felipe Guaman Poma de Ayala, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্ধ-সমাজভুক্ত একজন স্পেনিশ ইন্‌কা কথা ও ছবির মধ্য দিয়ে পেরুতে স্পেনিশদের বিজয় ও ধর্মপল্লীর জীবনের বিভিন্ন অন্যায়-অবিচার বর্ণনা করেছেন।

হয়। ১৬৩২ থেকে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর ফ্রান্সে প্রকাশিত যেজুইটদের প্রতিবেদনগুলো কানাডায় তাদের প্রেরণকর্মীদের কর্মতৎপরতার উপর সবিশেষ প্রাধান্য পেত। মিসিসিপি নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কানাডা ছিল লুইজিয়ানায় ধর্মপ্রচারক্ষেত্রগুলোর সূচনা-বিন্দু। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী কুইবেকের ধর্মপাল মন্সিনিয়র মন্তমোরেন্সি লাভালের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ানদের কাছে ধর্মপ্রচার কার্যের ফলাফল ছিল হতাশাব্যঞ্জক। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে মাত্র দু'হাজার ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টান ছিল।

স্পেনীয় যে অঞ্চলে (গুয়াডেলুপ, হাইতি) ফ্রান্স উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সেটি ছিল এন্টিলেস। এই এন্টিলেসে ধর্মীয় পরিবেশ খুব নিম্নমানেরই থেকে যায়। বিচ্ছিন্নতার ভয়ে রাজকীয় সরকার সেখানে কোন ধর্মপ্রদেশ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে দিতেন না। পুরোহিতদের মধ্যেও অনেকে নিম্ন গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ক্রীতদাসদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য যে সকল যেজুইট ক্রেয়োলভাষা শিখেছিলেন, তারা ঔপনিবেশিকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

৩। ভারতবর্ষ ও জাপানে ফ্রান্সিস জেভিয়ার

ফ্রান্সিস জেভিয়ারের দু'টি পদ্ধতি

ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে নাভারে জন্মগ্রহণ করেন। লয়োলার ইগ্নাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্যারিসে। তিনি ইগ্নাসের সাতজন সঙ্গীর একজন ছিলেন যারা ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্তমার্ত্রের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয়দের

কাছে একজন প্রেরণকর্মী হবার জন্য ইগ্নাস কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তিনি ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পূর্ব ভারতের কেন্দ্রস্থল গোয়ায় এসে পৌঁছেন। সেখানকার স্থানীয় ভাষা শেখার বা স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময় না পেয়েই তিনি অত্যন্ত দায়সারা গোছের ধর্মসার শিক্ষাদানের পরপরই দক্ষিণ পূর্ব ভারতের সমুদ্র তীরবর্তী মৎস্য শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকাসমূহের কয়েক হাজার মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত
[১৯৩] করেন। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালাক্কা ও ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মপ্রচারে যান।

১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি জাপানে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি কিয়ুসু দ্বীপের কাগোশিমায় অবতরণ করেন। জাপানের পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁর কাছে অনেকটা জটিল মনে হয়। এ জন্য তাঁকে তাঁর বাণীপ্রচারের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছিল। তিনি ভালমত স্থানীয় ভাষা শেখার, জাপানী দর্শন জানার, দেশীয় রীতি-নীতি – যেমন, রেশমী পোশাক পরিধান – পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। একজনকে ধর্মান্তরিত করতে হলে তার মন জয় করার জন্য বেশ সময় নিতে হয়। এমনই ছিল ফ্রান্সিস জেভিয়ারের 'দ্বিতীয় পদ্ধতি'-টা। তিনি জাপানী প্রজ্ঞার উৎপত্তিস্থল চীনে যাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্যান্টনের মুখোমুখি একটি

[১৯৩] ভারতে ফ্রান্সিস জেভিয়ার

গোয়ায় সাধু ফ্রান্সিসের প্রতিকৃতি

১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লেখা তাঁর এই চিঠিতে ফ্রান্সিস জেভিয়ার দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কোরের গ্রামগুলোতে ব্যবহৃত তাঁর বাণীপ্রচার কার্যের পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। পদ্ধতিটি খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হয় এবং তিনি যে সকল মানুষের সংস্পর্শে আসতেন, তাদের কৃষ্টি সম্পর্কে এতে কোন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে জাপানে গিয়ে ফ্রান্সিস প্রচারকার্যে অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত এগিয়েছেন। শিক্ষিত জাপানীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরণকর্মীদের কাছে মন-মানসিকতার উপযুক্ত গঠন-প্রশিক্ষণকে অত্যাবশ্যক ব'লে দাবী করেছেন।

"একমাসে আমি দশ হাজারেরও অধিক লোককে দীক্ষাস্নাত করেছি। এতে আমার অনুসৃত পদ্ধতিটা ছিল এরূপ ঃ অবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টধর্মে তাদেরকে দীক্ষিত করার জন্য আমাকে ডাকলে আমি তাদের গ্রামে পৌঁছে সেখানকার সমস্ত পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় সমবেত করতাম। এরপর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু ক'রে আমি তাদেরকে তিনবার ক্রুশের চিহ্ন করাই এবং এক ঈশ্বরকে স্বীকার ক'রে ত্রি-ব্যক্তির নাম করতে বলি। এরপর 'আমি ঈশ্বরের নিকট স্বীকার করি' এবং তারপর "শ্রদ্ধামন্ত্র", "দশ আজ্ঞা", "প্রভুর প্রার্থনা", "প্রণাম মারীয়া" ও "প্রণাম রাণী" প্রার্থনাগুলো আমি আবৃত্তি করি। দু'বছর আগে আমি উক্ত প্রার্থনাগুলো তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করেছি। এখন আমি সেগুলো মুখস্থ বলতে পারি। বার বার করলে পর তারা ছোট-বড় সকলেই তা পুনরাবৃত্তি করত।

প্রার্থনাগুলো বলা শেষ হলে আমি বিশ্বাসের সূত্রগুলোর উপর ও দশ আজ্ঞার আজ্ঞাগুলোর উপর তাদের নিজস্ব ভাষায় একটা ব্যাখ্যা দিই। তারপর আমি তাদের গত জীবনের সমস্ত পাপের জন্য আমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে তাদেরকে প্রকাশ্যে ক্ষমা যাচ্ঞা করাই ... ধর্মোপদেশের পর আমি ছোট-বড় সকলকে জিজ্ঞাসা করি তারা সত্যিই বিশ্বাস-সূত্রগুলো বিশ্বাস করে কিনা। তারা সকলে আমাকে বলে তারা তা বিশ্বাস করে, তাই আমি উচ্চঃস্বরে প্রতিটি সূত্রই আবৃত্তি করি। প্রতিটি সূত্রের পর আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতাম তারা সূত্রটি বিশ্বাস করে কিনা। তারা বুকে ক্রুশ আকারে তাদের দু'বাহু রেখে আমাকে বলে – তারা বিশ্বাস করে। এরপরই আমি তাদের দীক্ষাস্নাত ক'রে তাদের প্রত্যেকের নাম লিখে রাখি। এরপর পুরুষরা বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের স্ত্রীদের ও পরিবারকে পাঠায় যাতে আমি তাদের বেলায় যেভাবে দীক্ষাস্নাত করেছি, সেই একইভাবে তাদেরও দীক্ষাস্নাত করি। দীক্ষাস্নান প্রদান শেষ ক'রে আমি তাদের পাঠিয়ে দিই যাতে তারা গিয়ে যে মন্দিরগুলোতে তারা তাদের যত প্রতিমা রাখত, তা ভেঙ্গে ফেলে এবং এখন খ্রীষ্টান বলে আমি তাদেরকে দিয়ে প্রতিমার যত মূর্তি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করাই ।"

দ্বীপে তিনি ৩রা ডিসেম্বর ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

জেভিয়ার প্রবল আবেগে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে যে সমস্ত পত্র ইউরোপে লিখে পাঠাতেন, তা তাঁকে এক প্রকারে সাম্প্রতিককালের এক আদর্শ প্রেরণকর্মী করে তুলেছিল। তাঁর উক্ত পত্রাবলী অতি দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ করা হত এবং সময় সময় তা অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী রদবদলও করা হত। বিভিন্ন লোককাহিনী অনুযায়ী তিনি নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষকে দীক্ষাস্নান দিয়েছিলেন, অসংখ্য আশ্চর্য কাজও করেছিলেন।

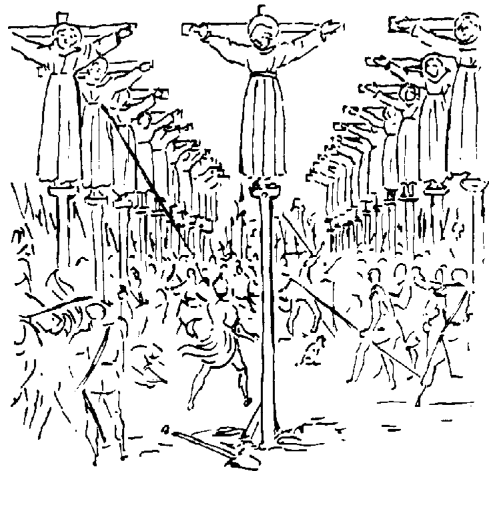

১৫৯৭ খ্রীঃ নাগাসাকিতে ধর্মশহীদদেরকে ক্রুশে ঝুলানো। ক্যালোট ১৬২২ খ্রীঃ এচিং-এর কাজ শুরু করেন, যে বছর বিপুল সংখ্যক খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে অগ্নিদগ্ধ ও শিরচ্ছেদ করা হয়।

জাপানের খ্রীষ্টীয় শতাব্দী

ইউরোপীয় সভ্যতার অভিনবত্বের প্রতি জাপানীদের ঝোঁক ও সেইসাথে তাদের নানা সামন্ত-রাজ্য-প্রথার দরুণ তাদের বিচ্ছেদের মধ্যে ছিল বহু ধর্মান্তরের কারণ। 'দাইমিয়' নামে খ্যাত স্থানীয় নেতৃবর্গ খ্রীষ্টধর্মকে বেছে নিয়ে তাদের স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন। খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৩০০,০০০-এ দাঁড়ায়। এরা ছিল প্রধানতঃ দক্ষিণাঞ্চলের, কিয়ুসু দ্বীপের এবং কিয়োতো ও এডো (টোকিও) অঞ্চলের অধিবাসী। যিনি এই প্রথম মণ্ডলীর গোড়াপত্তনের মূল প্রেরণাদাতা হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি হলেন যেজুইট ভালিগনানো, যিনি ১৫৭৯ থেকে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে পরিদর্শনকারী ছিলেন। তিনি সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় নাবিক ও প্রেরণকর্মী উভয়ের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তকুগাওয়া নামে পরিচিত নতুন শোগুন (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী) দাইমিয়দের বিরুদ্ধে জাপানী ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্বেগ এবং বৌদ্ধ ও শিন্টো ধর্মাবলম্বীদের বিরোধিতা – এ সবই খ্রীষ্টানদের নির্যাতন ডেকে আনে। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাব্বিশজন প্রেরণকর্মী ও খ্রীষ্টভক্তকে নাগাসাকিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র জাপানে খ্রীষ্টধর্মকে আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। অত্যন্ত ভয়ানক উৎপীড়নসহ মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শিমাবারার বিদ্রোহের পর ৩৫,০০০ খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে নির্বিচারে জবাই করা হয়। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রেরণকর্মীদের পক্ষে জাপানে আগমনের পথ রুদ্ধ হয়।

স্বল্প সংখ্যক প্রেরণকর্মী – যাদের সংখ্যা কখনো একশতের বেশী ছিল না – জাপানী ভাষা ও সভ্যতাকে বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তারা এমন কি বিভিন্ন অনুবাদ-গ্রন্থও প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তারা ইউরোপীয় কৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান জাপানীদের কাছে পৌঁছেও দেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কিছু জাপানীকে যাজক পদে অভিষিক্ত করা হয় (১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে চৌদ্দ জন)। ১৫৯৮ থেকে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একজন ধর্মপাল নাগাসাকিতে অবস্থান ক'রে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। দয়ুকুস (অর্থাৎ ধর্মব্রতধারী তবে যাজক না) কাটেখিস্ট বা ধর্মপ্রচারক, গ্রামের মোড়ল-মাতব্বর ও বিভিন্ন সংঘের সমন্বয়ে খ্রীষ্টসমাজ গঠন করা হত। এতে যাজকের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা হত। ধর্মপ্রচার ক্ষেত্র বা কেন্দ্রগুলোর অস্তিত্ব বহুলাংশে ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত দান এবং বিশেষভাবে ইউরোপ ও জাপানের মধ্যকার ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করত। তবে শেষোক্ত ব্যবসা সময় সময় মঙ্গলবাণী প্রচারকার্যের পরিপন্থীরূপেই কাজ করত।

ভারতবর্ষ

প্রেরিতশিষ্য টমাস কর্তৃক ভারতে মঙ্গলবাণী প্রচারের ব্যাপারটি অনুমান-নির্ভরও হতে পারে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই পঞ্চম শতাব্দী থেকেই। এ সমস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসী সিরীয় ভাষায় কথা

বলত এবং তারা মেসোপটেমিয়ার নেস্তরিউসপন্থী মণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পর্তুগীজরা গোয়ায় বসতি স্থাপন করলে তারা সেখানকার খ্রীষ্টানদের ল্যাটিন মণ্ডলীর অধীন করতে চেয়েছিল। আর এর ফল দাঁড়ায় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধর্মবিচ্ছেদ। গোয়া প্রথমে ছিল ধর্মপ্রদেশ, তারপর তা হয়ে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সমগ্র প্রাচ্যদেশের ধর্মপালের আসন। এই গোয়া থেকেই পর্তুগীজরা 'বিশুদ্ধ সঞ্চালন' পদ্ধতি অনুযায়ী এক সংক্ষিপ্ত মঙ্গলবাণী প্রচারের চেষ্টা করেছিল। কিছু সময় ফ্রান্সিস জেভিয়ার এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বহু দীক্ষাস্নান প্রদান করা হয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে একটি মণ্ডলী গড়ে ওঠেনি।

রবার্ট দে নবিলি (১৫৭৭-১৬৫৬) নামে একজন ইতালীয় যেজুইট ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং দক্ষিণ ভারতের মাদুরায় পঞ্চাশ বছর জীবন যাপন করেন। তিনি তামিল ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। পর্তুগীজ উপনিবেশে আত্মীভূত হতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পুণ্যার্থী হিন্দুদের অনুকরণে একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী রূপে তিনি পরিচিতি লাভ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জীবনধারা গ্রহণ করেছিলেন। সামাজিক আচার-আচরণ ও পৌত্তলিক রীতি-নীতির মধ্যে একটা পার্থক্য নির্ণয় ক'রে তিনি নবদীক্ষিত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের বর্ণগত প্রথাগুলো, যেমন – কুদুমি (চুল না কাটা) ও কোমরবন্ধ পরিধান করার প্রথা বজায় রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের নিকট অপছন্দনীয় দীক্ষাস্নানের যতগুলো ধর্মাচার, যেমন – দীক্ষার্থীর উপর ফুঁৎকার ও থু থু দেওয়ার মত আচারগুলো বাদ দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। নবিলির এ সমস্ত পদ্ধতি কয়েকজন প্রেরণকর্মীর বিরোধিতার উদ্রেক করে ও রোমের কাছে নিন্দাজ্ঞাপন করতে প্ররোচিত করে। পোপ মহোদয় ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে নবিলির কিছু কিছু রদবদল মেনে নেন। কোন কোন প্রেরণকর্মী সমাজের দীনহীনদের সেবায় আত্মনিয়োগ করার লক্ষ্যে পান্দারাস-এর মত নিম্নবর্ণের অনুতাপকারীদের জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রহণ করেন।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে লুথারানগণ ত্রাণকুয়েবারে বসতি স্থাপন করেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এটাই ছিল একটি অন্যতম সর্বপ্রথম প্রটেস্টান্ট বাণী প্রচার ক্ষেত্র। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতীয় ধর্মপালক অভিষিক্ত হন।

৪। চীন, ইন্দোচীন ও কোরিয়া

মাকাও থেকে পিকিং

পর্তুগীজরা মাকাও-এ বসতি স্থাপন করে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উপনিবেশে একটি জেজুইট ভবন স্থাপিত হয় ও এরই অল্পকালের মধ্যে একজন ধর্মপাল এখানকার যাজন-ক্ষেত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চীন দেশের ধর্মান্তরিতদের তাদের চুল কেটে ফেলে ইউরোপীয় জীবনধারা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যেজুইট পরিদর্শনকারী ভালিগ্নানো চীনের অভ্যন্তরে রজেরীও মাত্তেও রিচ্চি নামক দু'জন যাজককে প্রেরণ করেন। শেষোক্ত রিচ্চি ১৫৮২ ও ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে ৫টি ধাপে পিকিং গিয়ে পৌঁছেন। তিনি সেখানে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জীবনযাপন করেন।

রিচ্চি সর্বপ্রথমে একজ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাইরের বেশ ও চাল-চলন গ্রহণ করেন। চীনা ভাষা ও সভ্যতা নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ক'রে কনফুসিয়াসের শিষ্য সেই পণ্ডিতদের গুরুত্ব সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী হন। চীনাদের আচরিত তাও ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের চেয়ে তাঁর কাছে কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতবাদই খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে অধিকতর মিলবিশিষ্ট বলে মনে
[১৯৪] হয়। সেই থেকে রিচ্চি চীনা পণ্ডিতদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-যাপন প্রণালী গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, বিশেষ ক'রে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের জ্ঞান চীনাদের দান ক'রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রৈরিতিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। চীনা ভাষায় লিখিত তাঁর "স্বর্গ তত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা" নামক পুস্তকে তিনি কাথলিক শিক্ষা তুলে ধরেন। তবে চীনকে খ্রীষ্টবাণীর মন্ত্রে দীক্ষিত করার পথে কতগুলো দুরূহ সমস্যা ছিল, যথা – খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও কি চীনারা তাদের মৃত পিতামাতা ও কনফুসিয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অব্যাহত রাখতে পারে? চীনা ধর্মের সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঝুঁকি ছাড়াই খ্রীষ্টধর্মের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করতে কি চীনা শব্দাবলী ব্যবহার করা যেতে পারে? পরিশেষে, এক চীনা যাজক সম্প্রদায় কোথায় গঠন করা যাবে? তাদের জন্য ল্যাটিন ভাষা কি অপরিহার্য?

আশা ও সংকট

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল চীনা ভাষায় বাইবেল ও উপাসনিক পাঠগুলো অনুবাদের অধিকার দান করেন বটে, কিন্তু বাস্তবে কোন চীনা উপাসনার আবির্ভাব ঘটেনি। পণ্ডিত যেজুইটদের কাজ সম্রাটের দরবারে সমাদর লাভ করেছিল। এঁরা একটি বর্ষপঞ্জি তৈরী করেন, বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করেন ইত্যাদি। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা

[১৯৪] চীনকে খ্রীষ্টবাণীর মন্ত্রে দীক্ষিতকরণ

মাত্তেও রিচ্চি (১৫৫২-১৬১০)
চীন দেশে যেজুইট মিশনারী

এক নতুন ধরনের প্রেরণকর্মী – মাত্তেও রিচ্চি (১৫৫২–১৬১০)

"ফাদার মাত্তেও শিক্ষিত মানুষদের, প্রধানতঃ যারা নিজেদের বিধান প্রচারক বলে অভিহিত করত, তাদের পোশাক পরিধান করতেন। সত্যি সত্যিই এই পোশাক মার্জিত ছিল; তাঁর টুপিটা আমাদের টুপি থেকে সামান্য ভিন্ন ছিল এবং তা এমনভাবে তৈরী করা হত যা দেখলে একটি ক্রুশাকৃতি বিশিষ্ট বলেই মনে হত। শুধুমাত্র বাহ্যিক একটি পোশাক গায়ে চাপিয়ে তিনি ঐশ বিধান প্রচারক হিসাবে বেড়াতেন না, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা বা ভাষণ-বক্তৃতার মাধ্যমেই তা বেশী করতেন। কেননা তিনি তো কোন না কোন মূর্তি/প্রতিমা পূজারী ধর্মীয় উপদলকে (বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম) অসত্য বা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করার কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষিত লোকদের বেলায় তিনি যে শুধুমাত্র তাদের সমালোচনা করতেন তা নয় বরং তিনি তাদের উচ্চ প্রশংসাও করতেন, এমন কি তাদের গুরু কনফুসিয়াসকেও প্রশংসা করতে দ্বিধা করতেন না, কেননা কনফুসিয়াস পরলোক জীবনের সম্বন্ধে যা জানতেন না তা উপকথা দিয়ে পূরণ করতে চেষ্টা করেননি বরং নীরব রয়েছিলেন। আর প্রতিটি ব্যক্তির জীবনকে একটি সুষ্ঠুরূপ দান করতে এবং আইন ও সমতার ভিত্তিতে তার পরিবার ও রাজ্যে সুশাসন কায়েম করতে তিনি তাঁর বিধানের অনুশাসনগুলো সুবিন্যস্ত করেছিলেন।

এভাবে পোশাক পরে বাইরে যাওয়াটা কিছুটা অভিনব মনে হলেও তা কিন্তু শিক্ষিত মানুষদের জোর সমর্থন লাভ করেছিল। ফাদার মাত্তেও চীনা ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের একটি সারসংক্ষেপ এমনভাবে রচনা করেন যাতে তা প্রধানতঃ বিধর্মীদের উপযোগী হয়।"

নিকোলাস ত্রিগল, Hisoire de l' Expediton Chrétenne au royaume de la Chine (১৬১৭) থেকে উদ্ধৃত।

[১৯৫] চীনে মুমূর্ষু শিশুদের দীক্ষাস্নান প্রদান

দীক্ষাস্নান না পেয়ে যে সকল শিশু মারা যায়, তাদের চরম পরিণতি সম্পর্কে প্রেরণকর্মী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। একটি বিশেষ ধরনের ঐশতাত্ত্বিক শিক্ষা অনুযায়ী তাঁরা কোন পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গ বিবেচনা ছাড়াই যত বেশী সংখ্যক মুমূর্ষু শিশুকে দীক্ষিত করতে উদ্বুদ্ধ হন। পিকিং-এ অবস্থিত একজন যেজুইট ফাদার ইউরোপের একজন উপকারী বান্ধবীর কাছে লেখা এক পত্রে এরূপ প্রৈরিতিক কার্যের একটি বর্ণনা দেন।

"প্রতিটি বছরেই শুধু আমাদের পিকিং-এর গির্জাগুলোই পাঁচ থেকে ছয় হাজার এ ধরনের শিশুদের দীক্ষাজলে পরিশুদ্ধ করে। আমরা যতজন কাটেখিষ্টের ভরণ-পোষণ করতে পারি, সেই অনুপাতে এই ফসল কম-বেশী প্রচুর। আমাদের পর্যাপ্ত সংখ্যক কাটেখিষ্ট থাকলে তাদের পরিচর্যা মৃত্যুমুখী মুমূর্ষু শিশুদেরকে ছাড়িয়ে যেত; তারা তাহলে তাদের প্রবল উদ্দীপনা কাজে লাগানোর আরো সুযোগ পেতেন, বিশেষ করে বছরের সেই বিশেষ সময়গুলোতে যখন গুটিবসন্ত বা অন্যান্য মহামারী অবিশ্বাস্য সংখ্যায় ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণ কেড়ে নেয় ... অবিশ্বাসী ধাত্রীদের স্বমতে আনা যেত, যারা খ্রীষ্টান মেয়েদের তাদের সঙ্গে যেতে দিত। এমনটা প্রায়শঃ ঘটতে দেখা যায় যে, চীনারা তাদের বিশাল পরিবারকে ভরণ-পোষণ করা অসম্ভব দেখলে মেয়ে শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীদের আদেশ দেয় এক গামলা জলের মধ্যে শিশু মেয়েদের ডুবিয়ে দিতে। করুণ ও অসহায়ভাবে বলি-হওয়া এই শিশুরা – যারা পিতামাতার অভাবেরই বলি – যে জল তাদেরকে স্বল্পস্থায়ী ও নশ্বর জীবন কেড়ে নেয় সেই একই জলে তারা লাভ করতে পারত শাশ্বত জীবন।"

ফাঃ ডি' এন্ট্রিকোল্লেস-এর পত্র, পিকিং, ১৯শে অক্টোবর, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে Letters edifiantes et curieuses de Chine par des missionaries jesuites (1979) হতে উদ্ধৃত।

চতুর্দশ লুইয়ের গণিতবেত্তাগণ পিকিং এসে পৌঁছেন।

[১৯৫] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে চীনা খ্রীষ্টধর্মের জন্য সবকিছু খুবই আশাপ্রদ হয়ে উঠে বলে মনে হয়। তখন চীনে দুই কি তিন লক্ষ খ্রীষ্টান ও ১২০ জনের মতো প্রেরণকর্মী ছিল। কিন্তু উপাসনা-পদ্ধতি বা ধর্মাচার রীতিগুলোকে কেন্দ্র ক'রে ঝগড়া-বিবাদ এবং পর্তুগীজ ও "বিশ্বাস বিস্তার সংসদ"-এর মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব সম্রাটদের ক্ষেপিয়ে তুলে ফলে তারা নির্যাতন শুরু করেন। এই নির্যাতন থেকে কেবলমাত্র রাজদরবারের পণ্ডিত যেজুইটগণই রেহাই পেয়েছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যেজুইট সংঘ বাতিল করা হলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। শেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয় ফরাসী বিপ্লব।

ইন্দোচীন

তাদের নিজ দেশে নির্যাতন ভোগ করার পর জাপানী খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা কোচিন চীন, কম্বোডিয়া ও সিয়ামে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। যেজুইটগণ ১৬১৫ সালের পর থেকে এ সকল অঞ্চলের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করেন। তাঁরা ভিয়েতনামী ভাষাকে ল্যাটিন বর্ণমালায় লিপ্যন্তর করেন। কুড়ি বছর ধরে (১৬২৫ থেকে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ভিয়েতনাম ছিল যেজুইট আলেকজাণ্ডার দ্য রোডস্-এর প্রধান ভাবনার বিষয় যদিও তিনি সেখানে কখনও স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেননি। রোডসের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচারের ভিত্তিটাই ছিল ভাষা সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান, একটা স্থায়ী খ্রীষ্টীয় উপস্থিতির নিশ্চিত করার জন্য কাটেখিষ্টদের গঠন-প্রশিক্ষণ, ভিয়েতনামী কৃষ্টির সদ্ব্যবহার এবং এর রীতি-নীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা। তিনি স্থানীয় যাজকবর্গ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

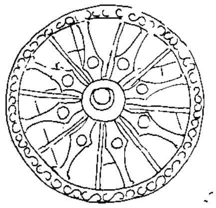

ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কোনার্কে ইন্দ্রের রথের চাকা (ইন্দ্র হলেন সূর্যদেবতা)

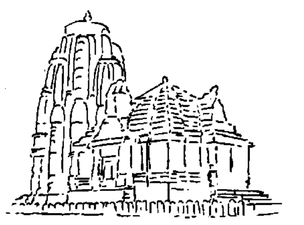

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে রাজানারীর মন্দির (দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী)

নৃত্যরত শিব (দ্বাদশ শতাব্দী)

[১৯৬] প্রৈরিতিক প্রতিনিধি-সংক্রান্ত ব্যবহার্য নিয়ম সম্পর্কে বিশ্বাস বিস্তার সংসদের নির্দেশ (১৬৫৯)

প্রৈরিতিক প্রতিনিধিদের (সরাসরি রোমের অধীন ধর্মপালগণ) নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বাস বিস্তার সংসদ রাজনৈতিক বাধামুক্ত বাণীপ্রচার তৎপরতায় আত্মনিয়োগের চেষ্টা চালায়। সংসদ সৎ পরামর্শ দিয়েছিল বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সব সময় বাস্তবায়ন করা সহজ ছিল না। ধর্মাচার বা উপাসনা-রীতি নিয়ে বিবাদে এটা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

"এ সকল লোকদের ধর্মাচার বা উপাসনা-রীতি, তাদের আচার-অভ্যাস ও তাদের রীতি-প্রথা পরিবর্তন করার লক্ষ্যে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাদের রাজী করার জন্য কোন অত্যুৎসাহকে কাজে লাগাতে যাবেন না, কোন যুক্তিও খাড়া করবেন না যদি না এ সমস্ত কিছু সুস্পষ্টভাবে ধর্ম ও নীতির পরিপন্থী ব'লে প্রতীয়মান। ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী বা ইউরোপের অন্য কোন দেশকে চীনাদের কাছে নিয়ে আসার চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে? তাদের কাছে আমাদের দেশ নয়, বরং আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে যান। এই ধর্মবিশ্বাস কোন জাতির ধর্মাচার ও রীতি-প্রথাকে প্রত্যাখ্যান বা আঘাত কোনটাই করে না যদি না তা ঘৃণার্হ হয়। বরং এ সমস্তকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করে। সত্যি বলতে কি, দেশীয় ঐতিহ্য ও নিজ দেশকে কদর করা, ভালোবাসা ও সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া সকল মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কোন জাতির স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি-প্রথাগুলো, বিশেষভাবে যেগুলো স্মরণাতীত কাল হতে আচরিত হয়ে আসছে, তা পরিবর্তন করার চেয়ে বিচ্ছেদ ও ঘৃণার অধিকতর জোরালো আর কোন কারণ নেই।"

প্রৈরিতিক প্রতিনিধি

ইউরোপের সঙ্গে রোডসের যোগাযোগের ফলে দূরপ্রাচ্যে প্রৈরিতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগের পথ প্রশস্ত হয় (১৬৫৮)। এঁরা ছিলেন এমন ধর্মপাল যাদের আয়ত্তে কোন সুনির্দিষ্ট এলাকা থাকত না, কিন্তু প্রেরণ-কার্যের জন্য তাঁরা সরাসরি পোপের বিশ্বাস বিস্তার সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন। পিয়ের দ্য লা মথ ও ফ্রাঁসোয়া পাল্লু প্রৈরিতিক প্রতিনিধিদ্বয় [১৯৬]
১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিয়াম এসে পৌঁছেন ঃ তাঁরাই সর্বপ্রথম ভিয়েতনামী যাজকদের অভিষিক্ত করেন ও সমগ্র দূর প্রাচ্যের জন্য একটি সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা জেজুইটদের পদ্ধতি হতে নিজেদের সম্পর্কচ্ছেদ করেন। অধিকারক্ষেত্র নিয়ে বাদানুবাদ বৃদ্ধি পায়।

কোরিয়ায় ভক্তসাধারণ পরিচালিত মণ্ডলী

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোরীয় পণ্ডিতগণ চীন দেশ থেকে আসা বই-পুস্তকের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে প্রথম [১৯৭]
জানতে পারেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ই-সেয়ুং-হুন নামে একজন তরুণ পণ্ডিত পিকিং-এ সমুদ্রযাত্রা পথে সেখানে

[১৯৭] কোরিয়ায় খ্রীষ্টধর্মের শুভ সূচনা

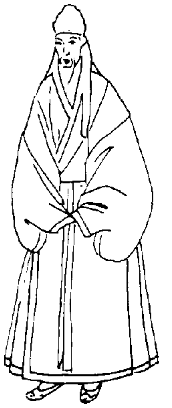

একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কোরীয় চিত্রকর্ম

কোরিয়ার সর্বপ্রথম স্বাধীন খ্রীষ্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যটি ছিল যে, এই মণ্ডলীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোরীয় ভক্তসাধারণের দ্বারা। ফলে পরবর্তীকালে এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এক পত্রে ই সেয়ুং-হুন (পিটার লি) পিকিং-এ অবস্থিত ফরাসী প্রেরণকর্মীদের নিকট কোরিয়ায় ধর্মীয় পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। তিনি বিচলিত হন, কারণ তাঁকে বলা হয় তিনি নাকি মণ্ডলীর নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধেই কাজ করছিলেন।

"যখন আমি (পিকিংস্থ ফাদারদের দ্বারা) দীক্ষিত হই, তখন আমার যা যা জানা উচিত ছিল, সে সম্পর্কে আমি শুধু ভাসাভাসা জ্ঞান লাভ করি ... আমি আমার নিজ দেশে ফিরে এসে সঙ্গে করে যে বইপত্রগুলো এনেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে আমার ধর্মকে অধ্যয়ন করা এবং আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তা প্রচার করার চেয়ে বেশী জরুরী-কর্তব্য আর কিছু ছিল না। আমার জীবনে আমি এমন একজন জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ পাই যিনি আমাদের ধর্মের একখানা বই পেয়েছিলেন। তিনি বইটি কয়েক বছর ধরে ভাল ক'রে অধ্যয়ন করেন ... তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমরা একে অপরকে ঈশ্বরের সেবা করতে সাহায্য-সহায়তা করেছি, এবং অন্যদেরও সাহায্য করেছি যেন তারা ঈশ্বরকে সেবা করে। এতে এক হাজারের মত মানুষ এই ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয় এবং ঐকান্তিকভাবে দীক্ষাস্নাত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই গণ-অনুরোধে সাড়া দিয়ে পিকিং-এ আমার দীক্ষাস্নানের সময় যে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করা হয়েছিল, সেগুলো অনুসারে তাদের কয়েকজনকে আমি দীক্ষাস্নাত করেছি। ঠিক তখনই নির্যাতনের প্রাদুর্ভাব ঘটে ঃ আমার পরিবার অন্য যে কোন পরিবার হতে বেশী কষ্টভোগ করে। এর ফলে আমি যীশু খ্রীষ্টেতে আমার ধর্মভাইদের সংসর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দীক্ষাস্নান যেন কোনভাবেই বন্ধ না হয়, সেজন্য আমি আমার জায়গায় অন্য দু'জনকে নিযুক্ত করেছি। এদের একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন যাঁর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। অন্যজন পূর্ববর্তীকালে ঢের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন ঃ গ্রেপ্তার হওয়ার এক বছর পর তিনি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের হেমন্তকালে মৃত্যুবরণ করেন।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালের দিকে খ্রীষ্টভক্তগণ কিভাবে একে অপরের নিকট তাদের পাপস্বীকার করবে, তা নিয়ে আলোচনার জন্য সমবেত হয়। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় কিয়া, ওয়াই ও পিন-এর নিকট তাদের পাপস্বীকার করবে, কিন্তু কিয়া ও ওয়াই এবং ওয়াই বা পিন কেউ পরস্পরের পাপস্বীকার শুনতে পারবে না। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ হেমন্তকালে পুনরায় সমবেত হয়। এবার স্থির হয় আমিই খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করব এবং আমিই হস্তার্পণ দেব। আমি তাদের ইচ্ছা শুধুমাত্র মেনেই নিইনি, সেই সঙ্গে অপর দশজনকেও খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গের ক্ষমতা প্রদান করেছি। ধর্মানুষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন বইপুস্তক যেমনটা লিখিত পাওয়া গেছে, সেগুলোই ও প্রাহরিক প্রার্থনাগুলো মেনে চলি – অবশ্য এতে কিছু কিছু যোগ দিয়ে এবং কিছু কিছু বাদ দিয়ে।

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কোরিয়ায় ফিরে এসে তিনি পিয়েক নামে অপর এক পণ্ডিতের সঙ্গে যৌথভাবে কনফুসীয় ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে একটি খ্রীষ্টীয় ঐশতত্ত্ব দাঁড় করান। ই সেয়ুং-হুন নিজেই দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার ও খ্রীষ্টযাগকে কেন্দ্র ক'রে একটি খ্রীষ্টসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি পিকিং-এর কাছে একজন যাজককে চেয়ে পাঠান। কিন্তু এই খ্রীষ্টীয় সমাজটি পরবর্তীকালে নির্যাতিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

রুশ এশিয়া

প্রাচ্যের দিকে বিস্তার লাভ করার ও আনুক্রমিক সাইবেরিয়া বিজয় শুরু করার আগ্রহের বশবর্তী হয়ে রুশ মণ্ডলী একটি মঙ্গলবাণী প্রচারধর্মী মণ্ডলীতে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে কাজানের মহাধর্মপালগণ নগরীর চারপাশের তাতারদের ধর্মান্তরিত করেন। ফিলারেৎ নামে তবলস্কের মেট্রোপলিটান ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাম্পটচাট্কায় ও ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াকুটস্কে কয়েকজন প্রেরণকর্মীকে পাঠান। কিছু সংখ্যক রুশ কয়েদী ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং-এ একটি অর্থডক্স খ্রীষ্টসমাজ গড়ে তোলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেক লাদোগা থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী এসে আলাস্কায় বসতি স্থাপন করেন ও অলেউসীয় ভাষাভাষী একটি খ্রীষ্টসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

।।৩ ।।ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রেরণকার্য-ক্ষেত্রসমূহ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সংকট

১। প্রেরণ কার্য-ক্ষেত্র ও ইউরোপীয় অভিমত

প্রেরণকার্য বিষয়ক লেখা

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রেরণকার্য-বিষয়ক লেখা অন্যান্য ভ্রমণকাহিনী বিষয়ক লেখালেখির মধ্যে বিপুল সাফল্য লাভ করে। ১৫৪৯ হতে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী ভাষায় জাপান দেশ বিষয়ক আটানব্বইটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। চীনের উপর অসংখ্য লেখালেখি হয়। যেজুইটদের প্রকাশনীর দু'টি নিয়মিত ধারাবাহিক রচনা মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে, যথা – 'নব্য ফরাসীর বর্ণনা' (১৬৩২ থেকে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি বাৎসরিক খণ্ড) এবং 'দুর্লভ এবং অনুসন্ধিৎসু পত্রাবলী' (১৭০২ থেকে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত ৩৪টি খণ্ড, প্রায়শঃ যার পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে)। এ সমস্ত লেখার কিছু কিছু, বিশেষ করে চীনা যেজুইটদের লেখাগুলোর বিপুল বৈজ্ঞানিক মূল্য ছিল এবং তা ইউরোপীয়দের মাঝে ভৌগলিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যঅবদান রেখেছিল। ইউরোপীয়রা অতি প্রাচীন ও ভিন্ন সভ্যতাগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। ইউরোপ ও চীন এ দু'অঞ্চলের
[১৯৮] মধ্যে যা কিছু পাওয়া যাচ্ছিল সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তারা যে পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তা দেখে দার্শনিক লাইবনিজ অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন।

অ-খ্রীষ্টানদের এক নতুন চিত্র

প্রেরণকার্য-ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে পরিচয় ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদেরকে অ-খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে ইতস্ততঃতার সঙ্গে নতুন ধ্যান-ধারণা লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। কোন কোন যেজুইট এমনও মনে করতেন চীনারা আদিম ঐশ প্রত্যাদেশের উপাদানগুলো এখনো ধারণ ক'রে আছে। কোন কোন বিজাতীয় ধর্মকে কি খ্রীষ্টধর্মের জন্য "প্রস্তুতি বা

পূর্বাভাস" স্বরূপ ধরে নেওয়া যেত না ? এরূপ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বোশুয়ে ও জানসেনপন্থীদের বিচলিত ক'রে তোলে। [১৯৯]

কোন কোন 'দার্শনিক' – বেইল, ভলতেয়ার, দিদেরো ও বিশ্বকোষ প্রণেতাগণের – মাঝে প্রেরণকার্য বিষয়ক লেখা খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল। চীনাদের সহনশীলতা চতুর্দশ লুইয়ের অ-সহিষ্ণুতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। চীনাদের নৈতিকতা প্রমাণ করে প্রত্যাদেশের অধিকারী হওয়াটা অপরিহার্য নয়। চৈনিক কালানুক্রম বাইবেলের কালানুক্রমকেও ছাড়িয়ে আরও পিছনে চলে গেছে। অধিকন্তু, অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু লোক যারা দাসত্ব-প্রথার নৃশংসতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, খ্রীষ্টানরা এর স্বপক্ষে যে সমস্ত ভ্রান্ত-যুক্তি তুলে ধরেছিল তারা সেগুলো মন্তব্য করেন।

২। প্রেরণকার্যের মহা সংকট

দূরপ্রাচ্যে পৃষ্ঠপোষকতার দরুণ লিসবন কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মপালগণ ও "বিশ্বাস বিস্তার সংসদ"-এর প্রেরিতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকারক্ষেত্র সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। তাই এক পক্ষ অপর পক্ষের যত সিদ্ধান্তকে রদ বা বাতিল করে দিত।

উপাসনা-রীতি সংক্রান্ত বিবাদ

অপেক্ষাকৃত মারাত্মক বিরোধটা ছিল উপাসনা-রীতি সংক্রান্ত, কেননা এই বিরোধ কর্মীদের মঙ্গলবাণী প্রচার বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ও অন্যান্য কৃষ্টির সম্মুখীন হলে খ্রীষ্টধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত – এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। ভারতবর্ষ ও চীনে কর্মীগণ কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন, যথা ভাষা – স্থানীয় ভাষায় ঈশ্বরের নাম কি

[১৯৮] ইউরোপ থেকে চীনকে যেভাবে দেখা হত

প্রেরণকর্মীগণ চীন সম্পর্কে যা যা বলতেন, অনেক ইরোপীয় চিন্তাবিদই সে ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন, তা পড়ে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

দার্শনিক লাইবনিজ চীন ও ইউরোপের মধ্যে সম্মিলনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি মনে করতেন এই সম্মিলন বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়কে একত্র করতে পারবে।

"আমি মনে করি নিয়তির এক অনন্য উদ্যোগই যেন আমাদের মহাদেশের অত্যন্ত সুসভ্য ও সবচেয়ে সু-শৃঙ্খল দু'টি চরম প্রান্ত ইউরোপ ও চীনকে একত্রে যুক্ত করেছে .... সম্ভবতঃ এ দু'টি সবচেয়ে সংস্কৃত বা পরিমার্জিত জাতি একে অপরের প্রতি তাদের দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে যা কিছু পাওয়া যাবে তা সমস্তই নিখুঁত বা উৎকৃষ্ট ক'রে তুলবে। আমার আশঙ্কা উপরোক্ত দু'জাতির সমস্ত সাদৃশ্যগুলো তুলনা করলে আমরা চীনাদের তুলনায় নিকৃষ্ট বলেই প্রতিপন্ন হব। প্রাকৃতিক ঐশতত্ত্বের ব্যবহার ও চর্চা শেখার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে প্রেরণকর্মীদের গ্রহণ করা প্রায় আমাদের অপরিহার্যই হবে, যেমন করে তাদেরকে প্রত্যাদিষ্ট ঐশতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য আমরা তাদের কাছে আমাদের প্রেরণকর্মীদের পাঠিয়ে থাকি। যীশু খ্রীষ্টের আলো দূর দেশগুলোতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এত চমৎকার যে, আমি বুঝতে পারি না কি আমাদেরকে ভিন্ন করে ... ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ও মানব জাতির মঙ্গলের জন্যও প্রেরণকার্য বর্তমানকালের সবচেয়ে বড় চিন্তা ব'লে আমি মনে করি।"

লাইবনিজ, ১৬৯৭ সালের পাঠাংশ থেকে।

[১৯৯] *চৈনিক কালানুক্রম বাইবেলের কালানুক্রমের পূর্ববর্তী বলে কোন কোন দাবিতে পাস্কাল বিচলিত হন।*

"চীনের ইতিহাস – আমি কেবল তাদেরই ইতিবৃত্ত বিশ্বাস করি, যার সাক্ষীরা বলীকৃত হতে প্রস্তুত।

মোশী ও চীন – এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী বিশ্বাসযোগ্য ?

এটা সংক্ষেপে দেখার বিষয় নয়। আমি আপনাদের বলছি এর মধ্যে কিছুটা অন্ধ করে দেবার, এবং কিছুটা আলোকিত করার ব্যাপার রয়েছে।

এই একটি কথায় আমি আপনাদের সমস্ত যুক্তি-তর্ক গুড়িয়ে দিচ্ছি। 'কিন্তু চীন অন্ধকারময় ক'রে তোলে', আপনারাই বলে থাকেন; আর আমি এর উত্তর দিই, 'চীন অন্ধকারময় ক'রে তোলে বটে, কিন্তু আলোকময়তা খুঁজতে হবে; তা খুঁজে নাও।' "

পাস্কাল, Pensees, 592

হবে ? উপাসনা – খ্রীষ্টীয় উপাসনা রীতিকে কি স্থানীয় ধর্মাচারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত ? ঐতিহ্যগত রীতি-প্রথা – খ্রীষ্টানদেরকে কি তাদের মৃত ব্যক্তিদের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন করতে ও বর্ণপ্রথা বজায় রাখতে দেওয়া উচিত ? ইত্যাদি ইত্যাদি। চীনের যেজুইটগণ কম-বেশী এসব অভিযোজন বা খাপ-খাওয়ানোকে মেনে নিয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মসংঘের কর্মীগণ (ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান, প্যারিস ফরেন মিশন) এরূপ খাপ খাওয়ানোকে মূর্তিপূজার বিশেষ সুবিধা বা ছাড় দেওয়ারই সামিল বলে বিবেচনা করতেন। এই বিরোধ প্রায়শঃ পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশ্বাস বিস্তার সংসদ-এর মধ্যে বিরোধকে উস্‌কে দিত। ইউরোপের এতদ্‌সংক্রান্ত চলমান তর্ক-বিতর্ক ক্রমবর্ধমান হারে পুরানো মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক বিরোধগুলো, যেমন – জানসেনপন্থীদের বিরুদ্ধে যেজুইটদের, রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থীদের দ্বন্দ্ব এগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়।

চৈনিক ও মালাবারের ধর্মাচারের নিন্দা

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তা ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এসে তীব্রতর হয়ে ওঠে। চীনের প্রৈরিতিক প্রতিনিধি মনসিনিয়র ম্যাগ্রো চীনা ভাষায় ঈশ্বরকে বুঝাতে ব্যবহৃত যেজুইটদের পরিভাষা ব্যবহার এবং খ্রীষ্টানদের দ্বারা ঐতিহ্যগত চৈনিক ধর্মাচার (পূর্বপুরুষ ও কনফুসিয়াসের প্রতি ভক্তিজ্ঞাপন) পালন করা নিষিদ্ধ করেন। যেজুইটগণের অনুরোধে সম্রাট কাং-হি -এর থেকে ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা পাওয়া সত্ত্বেও [যেমন – এই
[২০০] ধর্মাচারগুলো ছিল নিছক বিধানিক ক্রিয়াবলী] ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাটিকানের পুণ্য কার্যালয় মন্সিনিয়র ম্যাগ্রোর মূল অবস্থানকেই সমর্থন করে। সমস্যাটি সরেজমিনে তদন্ত ক'রে দেখার জন্য পোপ চার্লস দ্য মেলার্দ দ্য তুর্ণো নামে তাঁর একজন দূতকে প্রেরণ করেন। তিনি এসে ভারতবর্ষে (মালাবার উপাসনা-রীতি) ও চীনে উপাসনা-রীতির দেশীয়করণ বারণ করেন। নজরবন্দী থাকা অবস্থায় তিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মাকাও-এ প্রাণত্যাগ করেন। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপ আনুষ্ঠানিকভাবে চৈনিক ও মালাবার উপাসনা-রীতিকে নিন্দাজ্ঞাপন করেন। প্রেরণকার্যক্ষেত্রে প্রবল হৈ-হট্টগোলের মুখে নতুন দূত মেজ্জাবার্বা যিনি কোনভাবে প্রাণে বেঁচে ইউরোপে এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন, কিছু কিছু ছাড় দিতে রাজি হন (১৭২১)। কিন্তু এতে কোন কাজ হয়নি। অবশেষে, ১৭৪২ ও ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন ক'রে চৈনিক ও মালাবার উপাসনা রীতি নিন্দিত হয়। এক্ষেত্রে যথেষ্ট বাধা-বিপত্তি থাকায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

[২০০] ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ একাদশ ক্লেমেন্ট কর্তৃক চৈনিক ধর্মাচারের নিন্দাজ্ঞাপন

"৩। কোন ভাবেই বা কোন কারণে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টানদেরকে এমন এক আনুষ্ঠানিক বলিদান বা পূর্ণাহুতি ধর্মানুষ্ঠান চালাতে, যাজকরূপে সেবা অর্পণ করতে, কিংবা অংশ নিতে অনুমতি দিতে পারে না... যেগুলো প্রথাগতভাবে কনফুসিয়াস ও মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমকালে (equinox) করা হয়ে থাকে, কারণ এ সমস্ত অনুষ্ঠান যে কু-সংস্কার পরিব্যাপ্ত।

৭। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ চীনাদের প্রথা অনুযায়ী তাদের পূর্বপুরুষদের সম্মানার্থে নিজেদের বাড়ীতে এমন কোন লিপিফলক রাখতে পারবে না যার উপর 'সিংহাসন' বা 'আত্মার আসন' কিংবা তেমন ব্যক্তির 'প্রাণ' ইত্যাকার কথা লেখা থাকে – এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়ে থাকে যে, তেমন মৃত ব্যক্তির প্রাণ বা আত্মা এসে সময় সময় সেখানে থামে বা বিশ্রাম করে।"

প্রেরণকার্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির শিকার

ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণে কাথলিক রাষ্ট্রশক্তিগুলোর হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণকার্যমূলক তৎপরতাও দুর্বল হতে শুরু করে। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেখ্ট চুক্তি সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্পেন ও ফ্রান্সের হাত থেকে কেড়ে নেয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস চুক্তি আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য সূচিত করে।

সকল কাথলিক রাষ্ট্রে "যীশু-সংঘ বাতিলকরণ" ঘোষিত হওয়ার পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ কর্তৃক তা বন্ধ ক'রে দেয়ার ফলে সমগ্র বিশ্বে ৩০০০ কর্মীর কর্মতৎপরতার অবসান ঘটে। অন্যান্য সংঘ বা ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম ছিল। বিপুল সংখ্যক খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে নিরুপায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফরাসী বিপ্লব প্রেরণকার্যের নিমিত্তে নিয়োজিত সম্পদ ও কর্মীসংখ্যা প্রায় নিঃশেষের দিকে নিয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির প্রাধান্যের কারণে সমুদ্রপথে ফরাসী কাথলিক কর্মীদের চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তাঁরা যেখানে যে শূন্যতা রেখে যান, তা-ই পরবর্তীকালে পূরণার্থে গ্রেট ব্রিটেনে প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী-ধর্মসংঘের উৎপত্তি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্বাস বিস্তার সংসদ-এর চূড়ান্ত মূল্যায়ন পেশ ছিল সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গেরই সামিল। এ সময় কিছুটা শক্তিহীনতাবোধ দানা বেঁধে ওঠে। "সত্যিকার অর্থে প্রাচ্যকে ধর্মান্তরিত করার অভিপ্রায় পাশ্চাত্যকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে।" তবে আমাদের মনে রাখতে হবে খ্রীষ্টমণ্ডলী এখন পুরোপুরিভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। খ্রীষ্টধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতার মধ্যে সংলাপের সমস্যার ব্যাপারে কোন উত্তম সমাধান পাওয়া না গেলেও সমস্যাটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়েছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে যতটা হবে তার চেয়ে বেশী সুবিবেচনাপূর্ণ ছিল এ সময়।